জ্ঞানবাপীর কুয়োয়
স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ
— পৃঃ ১৫

দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

পঁচাশি বছর ধরে
চলছে জ্ঞানবাপী
বিতর্ক— পৃঃ ২৪

৭৪ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা।। ৬ জুন, ২০২২।। ২২ জ্যৈষ্ঠ - ১৪২৯।। যুগাব্দ - ৫১২৪।। website : www.eswastika.com

জ্ঞানবাপীর অন্তরালে

১৯৯১ : প্রথমবার মামলা করে পূজা করার অনুমতি চাওয়া হয়।

১৯৯৩ : এলাহাবাদ হাইকোর্ট যথাস্থিতি বজায় রাখার নির্দেশ দেয়।

২০১৮ : সুপ্রিম কোর্ট স্থিতাবস্থার বৈধতা ছ'মাসের জন্য ঘোষণা করে।

২০১৯ : বারাণসী কোর্টে পুনরায় এই মামলার শুনানি শুরু হয়।

২০২১ : ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট জ্ঞানবাপীর পুরাতাত্ত্বিক সার্ভে করার অনুমতি দেয়।

২০২২, ৬ মে : আদালতের নির্দেশমতো মসজিদের সার্ভে শুরু হয়।

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৪ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা, ২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

৬ জুন - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৪,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

'তুই বেড়াল না মুই বেড়াল', চালুনি করছে ছুঁচের বিচার
☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

ঠিকাদার কংগ্রেস পার্টি ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

দাসপ্রথার সময়কার হিংস্র অস্ত্র আইনই চালু রাখতে চায় শ্বেতাঙ্গ মহিলারা ☐ চিদানন্দ রাজঘাটা ☐ ৮

বিচারব্যবস্থার ওপর আক্রমণ আমাদের গণতন্ত্রকেই সংকটগ্রস্ত করছে ☐ বিশ্বামিত্র ☐ ১০

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা দপ্তরে মাৎস্যন্যায়
☐ ড. নারায়ণ চক্রবর্তী ☐ ১১

আলমগিরনামা বলছে বিশ্বনাথ মন্দির ভেঙেছিলেন আওরঙ্গজেব ☐ বিনয়ভূষণ দাশ ☐ ১৩

জ্ঞানবাপী কুয়োয় স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ ☐ দুর্গাপদ ঘোষ ☐ ১৫

প্রবাসী বাংলাদেশির চোখে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ
☐ শিতাংশু গুহ ☐ ১৮

স্কন্দপুরাণে রয়েছে জ্ঞানকূপের উল্লেখ
☐ অভিরূপ গঙ্গোপাধ্যায় ☐ ২৩

পঁচাশি বছর ধরে চলছে জ্ঞানবাপী বিতর্ক
☐ নিখিল চিত্রকর ☐ ২৪

মসজিদের ভেতরে ছবি তুলতে দিতে মুসলমানদের আপত্তি কেন ☐ চন্দ্রভানু ঘোষাল ☐ ২৬

মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরির আরও পাঁচটি দৃষ্টান্ত
☐ চন্দ্রভানু ঘোষাল ☐ ২৮

দশহরার দশকাহন ☐ নন্দলাল ভট্টাচার্য ☐ ৩১

শিবাজীর রাজ্যাভিষেক তিথি হিন্দু সাম্রাজ্যদিনোৎসব
☐ মন্দার গোস্বামী ☐ ৩৩

যুদ্ধে হারের লজ্জায় আত্মহত্যা করলেন জয়পাল দেব
☐ সন্দীপ চক্রবর্তী ☐ ৩৫

পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা কি ঘুমিয়েই থাকবে?
☐ মণীন্দ্রনাথ সাহা ☐ ৩৭

নাস্তিক মার্কসবাদীদের ধর্মপ্রীতি ☐ ধীরেন দেবনাথ ☐ ৪৩

ভারত ভাগের সমর্থক সর্বকালের সেরা বাঙ্গালি
☐ রুদ্র প্রসন্ন ব্যানার্জী ☐ ৪৪

শিক্ষকদের যথার্থ প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বুঝেছে সরকার
☐ শেখর সেনগুপ্ত ☐ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ☐ অঙ্গনা : ২১ ☐ সুস্বাস্থ্য : ২২ ☐ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ ☐ খেলা : ৩৯ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ☐ স্মরণে : ৪৬ ☐ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৯ ☐ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে
১৩ জুন
২০২২

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১৩ জুন
২০২২

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

মানসিক চাপ কমাতে ধ্যান

আজকাল অনেকেই মানসিক অবসাদে ভুগছেন। বিশেষজ্ঞরা বলেন, পড়াশোনা ও কেরিয়ারের মারাত্মক চাপেই এই মানসিক অবসাদ। তাঁরা আরও বলেন, মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে ধ্যান। নিয়মিত ধ্যান করলে বাচ্চাদের মনঃসংযোগ বাড়ে। মানসিক অবসাদও অনেকাংশে প্রশমিত হয়। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যা মানসিক চাপ কমাতে ধ্যানের ভূমিকা কতটা।
লিখবেন— ডা: অভিজিৎ ঘোষ, ডা: উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিল চিত্রকর প্রমুখ।

দাম একই থাকছে, বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার পাঠক, গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের জানানো হচ্ছে যে, বিশেষ কারণবশত আগামী ৪ জুলাই, ২০২২ সংখ্যা থেকে স্বস্তিকা'র প্রতি কপির মূল্য ১৬.০০ টাকা এবং বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৭০০.০০ টাকা করা হচ্ছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বস্তিকার মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিতে হলো, এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

আশাকরি আপনারা আমাদের অসুবিধার কথা অনুভব করে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবেন।

আগামী জুলাই মাস থেকে স্বস্তিকায় দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ঠিকানায় পাঠাবেন—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name : **INDIAN OVERSEAS BANK**
Sreemani Market Branch, Kolkata - 700 006

সারদা প্রসাদ পাল
প্রকাশক, স্বস্তিকা

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সত্য উন্মোচিত হইতে শুরু করিয়াছে

মিথ্যার আবরণে চাপা পড়িয়াছিল ভারতবর্ষের ইতিহাস। সত্য চাপিয়া রাখিবার এই কুকর্মটি করিয়াছিলেন তথাকথিত কংগ্রেসি ও কমিউনিস্ট ইতিহাসবিদরা। দেশের পরাধীনতার কালে এই কুকর্মটি করিয়াছে আক্রমণকারীদের সঙ্গে আসা স্বঘোষিত লিখিয়েরা এবং ব্রিটিশ শাসনকালে তাহাদেরই পৃষ্ঠপোষক ইতিহাসবিদরা। স্বাধীনোত্তর কালে এই কাজটিই করিয়াছেন বিদেশিদেরই ওই যোগ্য উত্তরসূরিরা। এবং তাহা করা হইয়াছে দেশের শাসককুলের নির্দেশেই। স্বাধীনতার পর বিগত সত্তর বৎসর ধরিয়া এই দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের সেই বিকৃত ও মিথ্যা ইতিহাসই পড়াইয়া তাহাদের দীর্ঘ সময় স্বাভিমানশূন্য করিয়া রাখা হইয়াছিল। এখন দিন বদল হইয়াছে। প্রকৃত শাসকের হাতে দেশের শাসন ভার আসিয়াছে। স্বাভাবিকভাবেই মিথ্যার আবরণ খসিয়া পড়িয়া সত্য উদ্‌ঘাটিত হইতে শুরু করিয়াছে। ইতিমধ্যে রামজন্মভূমি মন্দিরের সত্য বিশ্ববাসীর সামনে উন্মোচিত হইয়াছে। এইবার উন্মোচিত হইতে শুরু করিয়াছে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের সত্য ইতিহাস। কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের সত্য সামনে আসিবার সংবাদে দেশ জুড়িয়া হিন্দু জনমানসে আশার সঞ্চার হইয়াছে। বর্তমান মন্দিরটি ইন্দোরের মহারানি অহল্যাবাঈ হোলকার প্রতিষ্ঠিত। আসল মন্দির জ্ঞানবাপী মসজিদে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। বর্তমান মন্দির যাহারা দর্শন করিয়াছেন তাহারা জানেন তথাকথিত জ্ঞানবাপী মসজিদের সন্নিকটে দেওয়াল অভিমুখে শিববাহন নন্দী বসিয়া রহিয়াছেন। অর্থাৎ নন্দী বাবা বিশ্বনাথের ভক্তগণকে ইঙ্গিত করিতেছেন বাবার অধিষ্ঠানটি মসজিদে পরিণত করা হইয়াছে। বাবার মন্দিরটি যে ধ্বংস করা হইয়াছে তাহা ইতিহাস প্রমাণিত। অবশেষে সাহসী পঞ্চকন্যার অভিযোগের ভিত্তিতে আদালতে তত্ত্বাবধানে সত্য উন্মোচিত হইতে শুরু করিয়াছে। মসজিদ অভ্যন্তরে মন্দিরের বহু নিদর্শন মিলিয়াছে। এমনকী জলাশয়ের মধ্যে মিলিয়াছে শিবলিঙ্গ। বিকৃতমনা দলদাস বুদ্ধিজীবীরা ইহাতেও মিথ্যার প্রলেপ লাগাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাহারা জানিয়াও স্বীকার করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন যে, ইসলাম কখনোই একটি ধর্ম নহে, এইটি শুরু হইয়াছিল এবং অদ্যাবধি অব্যাহত রহিয়াছে এক সর্বগ্রাসী প্রবণতা এবং সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাভিলাষযুক্ত জেহাদি রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসাবে। ইহা জানিয়াও তাহারা মুঘল-পাঠান-তুর্কি শাসনকালের পাহাড়প্রমাণ হিংস্রতাকে আড়াল করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইহার কারণ হইল ইসলামের সহিত কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের জন্মগত ঘনিষ্ঠতা। পদলেহন করিয়াই তাহারা বর্তমান ইসলাম অনুসারীদের কৃপা প্রাপ্ত হইয়া ক্ষমতার ছিটেফোঁটা ভোগ করিয়া থাকেন।

আনন্দের বিষয় হইল, রামজন্মভূমির পর কাশী বিশ্বনাথের সত্য উন্মেচিত হইতে শুরু করিতেই দেশ জুড়িয়া মন্দির ধ্বংস করিয়া নির্মিত মসজিদগুলিরও আদালতের তদন্তের দাবি উঠিতেছে। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল মথুরার কেশবদেব মন্দির ও শ্রীকৃষ্ণজন্মস্থান মন্দির, জৈনপুরের অটলদেব মন্দির, গুজরাটের রুদ্র মহালয় মন্দির ও ভদ্রকালী মন্দির, পশ্চিমবঙ্গের মালদহের আদিনাথ মন্দির, মধ্যপ্রদেশের বিদিশা মন্দির, দিল্লির সূর্যমন্দির এবং কাশ্মীরের কয়েকটি মন্দির। স্থানীয়ভাবে বহু মন্দির যাহা ইসলামি শাসনকালে মসজিদে পরিণত করা হইয়াছে, তাহারও দাবি উঠিতে শুরু করিবে সন্দেহ নাই। এই কথা বলিতেই হয়, ভারতবর্ষ তাহার দীর্ঘ নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহার জয়যাত্রা শুরু হইয়াছে। বিদেশি আক্রমণকারীর কলঙ্কচিহ্ন মোচন করিয়া ভারত স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। এই সত্য উন্মোচনের তীব্র আলোয় কংগ্রেস-কমিউনিস্টদের মুখ লুকাইতেই হইবে। তাহারা সময়ের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হইবে।

সুভাষিতম্

সুশীলো মাতৃপুণ্যেন পিতৃপুণ্যেন পণ্ডিতঃ।

দাতৃত্ব বংশপুণ্যেন আত্মপুণ্যেন সভাগ্যতঃ॥

মাতার পুণ্যফলে সুচরিত্র প্রাপ্ত হয়, পিতার পুণ্যের কারণে পাণ্ডিত্য প্রাপ্ত হয়, বংশের কারণে দানশীলতা প্রাপ্ত হয় এবং নিজ পুণ্যফলে সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়।

‘তুই বেড়াল না মুই বেড়াল’, চালুনি করছে ছুঁচের বিচার

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

কথায় বলে চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি আর চালুনি করে ছুঁচের বিচার। মমতা আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলকে শুদ্ধ করতে রাস্তায় নেমেছেন। অভিষেক নিজেই অভিযুক্ত। ইডি তাঁকে ১৭ ঘণ্টা জেরা করেছে। মমতাকে বলা হচ্ছে ‘ফাউনটেন হেড অব কোরাপশন’। দুর্নীতির উৎসমুখ। কিন্তু খাতায় কলমে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। ২০১৩ সালে সারদা চিটফান্ড কেলেঙ্কারির নায়ক পলাতক সুদীপ্ত সেনের একটি চিঠিতে তাঁর নাম উল্লিখিত ছিল। অভিষেক আর মমতার প্রয়াসকে অনেকে বলছেন ‘চালুনি করে ছুঁচের বিচার’। তৃণমূলের যা হাল তাতে দলের মধ্যে ওঁদের ধর্মবাণী শোনার কেউ নেই। দু’জনে তুই বেড়াল না মুই বেড়াল করে আঁচড়াতে চাইছেন। তৃণমূল দুর্নীতির শেষ স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছে। ১৯৯৫-এ সিপিএমকে দুর্নীতিবাজের পার্টি বলেছিলেন আদর্শবাদী সিপিএম নেতা শ্রদ্ধেয় বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী। অভিযোগ উঠেছিল সিপিএম ‘দালাল কন্ট্রাক্টর (ঠিকাদার) আর ভেড়ি মালিকের পার্টি’। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ক্যাবিনেটকে ‘চোরের ক্যাবিনেট’ বলে সরে দাঁড়িয়েছিলেম তাঁর উত্তরসূরী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন তৃণমূল ঠিকাদারের পার্টি।

তাই জানিয়েছেন হয় দল করুন নয় ঠিকাদারি। অনেকে বলছেন চালুনি করে ছুঁচের বিচার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই বলেছেন দল দেখিয়ে ‘খাওয়া’ চলবে না। বিনয়বাবুর সঙ্গে অভিষেক বা মমতার তুলনা করা অর্বাচীনের কাজ। তাই শুধু উদাহরণ টানছি। ৩৪ বছরের বাম জমানায়

সিপিমের ৩৪ বছরে পশ্চিমবঙ্গ দেখেছিল ‘অর্গানাইজড ভায়োলেন্স বা সংগঠিত হিংসা’, আর মমতা জমানায় ‘আনঅর্গানাইজড ভায়োলেন্স বা অসংগঠিত হিংসা’।

রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতানোর শেষ ধাপে পৌঁছে যায় সিপিএম। জ্যোতি বসু বা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণ বা আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ নেই। বেঙ্গল ল্যাম্প কেলেঙ্কারিতে জ্যোতিবাবুর ছেলে চন্দন (শুভব্রত)-র বসুর নাম জড়ায়। কিছু প্রমাণ হয়নি। বিরোধীরা বলত বুদ্ধদেববাবুর কন্যা সুচেতনা ভট্টাচার্যকে সর্বদা বাড়তি সুযোগ দেওয়া হয়। কী সুযোগ কেউ বলতে পারেনি।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে সিপিমের ৩৪ বছরে পশ্চিমবঙ্গ দেখেছিল ‘অর্গানাইজড ভায়োলেন্স বা সংগঠিত হিংসা’, আর মমতা জমানায় ‘আনঅর্গানাইজড ভায়োলেন্স বা অসংগঠিত হিংসা’। হিংসার সংগঠিত রূপ রাজনৈতিক। সিপিএম তা দেখিয়েছিল। যেমন গণপিটুনি তে খতম বা গণহত্যা করে বিরোধিতা ধ্বংস করা। আর অসংগঠিত রূপ কাটমানি, সিন্ডিকেট, তোলাবাজি, স্বজনপোষণ, ব্যাংকে আয় বহির্ভূত অর্থ জমা, বিদেশে টাকা পাচার, কয়লা বা গোরু পাচারের বেআইনি অর্থ জমিয়ে নেওয়া, অসাধু চিট ফান্ডের কাছে জোর করে ছবি বিক্রি করিয়ে দলের জন্য টাকা তোলা। মমতার নেতা মন্ত্রীরা বিভিন্ন ধরনের আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে হয় জেল খেটেছেন নয় জেল বাঁচাতে কোর্ট ঘর করছেন। তদন্ত এড়াতে রোগী সেজে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন অথবা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। সিপিএম জমানায় ওসব ছিল না। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস করে তারা অভিযোগের ফাইল উধাও করে দিত। তাই তাদের কোনো মন্ত্রী জেল খাটেনি। ২০১১ ক্ষমতায় এসে মমতাই প্রথম তাঁদের মেদিনীপুরে নেতা সুশান্ত ঘোষকে জেলে ভরেন। সিপিএম দলীয় কায়দায় তাদের অভিযুক্ত নেতাদের বহিষ্কার নয়তো সাসপেন্ড করত। আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হতো না। সিপিএমের মতো মমতাও তাই চান। প্রচার মাধ্যমের দাপটে তা আর সম্ভব নয়। তবে এটা অবশ্যম্ভাবী যে মমতা আর অভিষেকের জোড়া শূলে তৃণমূলের সংবিৎ ফিরবে না। আচার্য চাণক্যের মতে ‘যে রাজা সঠিক দণ্ড দিতে পারেন তিনি পূজার যোগ্য। প্রজারা সম্পন্ন হলে রাজা ছাড়াই রাজ্য চলে। প্রজার ক্রোধ সকল ক্রোধের চেয়ে ভয়ংকর। তাই দুরাচারী নীচ রাজার থাকার থেকে না থাকা ভালো--- ‘অবিনীত স্বামিলাভাদস্বামিলাভঃ শ্রেয়ান্।’ □

সংশোধন

গত সংখ্যায় রাজ্যপাট বিভাগে প্রতিবেদক নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়ের নাম মুদ্রিত না হওয়ায় আন্তরিক ভাবে দুঃখিত।

—স্ব: স:

ঠিকাদার কংগ্রেস পার্টি

তদন্তক্লান্তষু যুবরাজ,

সিবিআই, ইডি সবাই আছে। গোরু, কয়লা অনেক কিছু আছে। আপনি আছেন, আপনার স্ত্রীও আছেন। সব মিলিয়ে জানি আপনি তদন্তে তদন্তে ক্লান্ত। তবু সময় করে এই চিঠিটা প্লিজ পড়বেন।

আমার অভিনন্দন নেবেন। সম্প্রতি আপনি পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও দশ রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসকে ক্ষমতায় আনার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। ত্রিপুরা, গোয়ায় মুখ পোড়ার পরেও অসমে পার্টি অফিস উদ্বোধন করতে গিয়ে সেকথা জানিয়েছেন। বলেছেন, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পাওয়ার পরে ওটাই আপনার স্বপ্ন। ওটাই আপনার লক্ষ্য।

ঠিকই বলেছেন। স্বপ্নের পোলাওতে ঘি একটু বেশিই ঢালতে হয়। এক কেজি চালের পোলাও বানাতে এক ক্যুইন্টাল ঘি দিলেও বলার কেউ নেই। ভাড়া করা স্তাবকরা হাততালিতে ফাটিয়ে দেবে। দিয়েছেও। আর তাতেই আপনি উজ্জীবিত। ভালো। খুব ভালো।

এটুকু পর্যন্ত ঠিক ছিল। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো স্বপ্নটা আপনি সম্প্রতি দেখে ফেলেছেন। এবং শুধু দেখাই নয়, সেটা বাস্তবায়িত করতে দলের নেতা, কর্মীদের নির্দেশও দিয়েছেন। সে দিন মনে হয় আপনি হলদিয়ায় গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়েই বলেছেন, ঠিকাদাররা পার্টি করতে পারবে না। যে কোনো একটা বেছে নিতে হবে। হয় ঠিকাদারি, নয় তৃণমূল কংগ্রেস।

খুব ভালো প্রস্তাব। কিন্তু তাতে আপনার দল চলবে তো? আপনি জানেন, তবু বলে রাখি, আপনার দলের ৮০ শতাংশ নেতা, কর্মী, বিধায়ক ঠিকাদার। নানাভাবে তারা ঠিকাদারি করেন। আপনার পিসি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর তাঁরা ফুলেফেঁপে ঢোল হয়েছেন। কুঁড়ে ঘর হয়ে গিয়েছে অট্টালিকা। আমি অন্যান্য সরকারি সুবিধা কিংবা সাধারণের থেকে কাটমানি

খাওয়া, সরকারি চাকরি সুপারিশের ভিত্তিতে হওয়ার মতো বিষয়গুলিকে বাদই দিচ্ছি। শুধু যদি ঠিকাদারির কথা বলা হয় তবে রাজ্যের ছেলে বুড়ো সবাই জানে, ওই ব্যবসাটি তৃণমূল না করলে সম্ভব নয়। কবে কোন প্রকল্পের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ করা হবে সেটা অন্য দলের কেউ বেশিরভাগ সময়ই জানতে পারেন না। এটাই এই রাজ্যের দস্তুর। ঠিক যেমনটা ছিল সিপিএম জমানায়।

বাংলায় আপনার দলের ক্ষমতায় আসার যে লড়াই তাতে কৌশল ছিল বেশি। আর তাতে বড়ো ভূমিকা নিয়েছিলেন সিপিএম আশ্রিত ঠিকাদাররাই। তারাই রং বদলে পুঁজি ঢেলেছিলেন ঘাসফুলে। তাতেই ঘাসফুল ফুটেছে। তাদের হাতেই লোকাল ছেলেরা রয়েছে। তারাই পোষেন। হ্যাঁ, খুব ভেবে চিন্তেই এই শব্দটা লিখলাম। এই কারণে আপনার দলে সাংসদ বা বিধায়ক হওয়ার চেয়েও পুরসভার প্রতিনিধি হওয়া বা পঞ্চায়েত, জেলাপরিষদের দায়িত্ব অনেক বেশি লোভনীয়। সবাই সেটা চায়। আপনাদের অনেক বিধায়কও তাই পুর প্রতিনিধি হয়ে আয় করেন। আর মন্ত্রী হয়ে আসন অলংকৃত করেন। তাঁরা জানেন, মন্ত্রী হয়ে অত পয়সা রোজগার করা যাবে না, যেটা বেনামে ঠিকাদারি করে আসবে। তাই পুরসভা ও পঞ্চায়েত তাঁদের আসল লক্ষ্য।

তাই বলছি, আপনি যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তাতে দলটা থাকবে তো! নেতা কোথায় পাবেন? টাকা কোথায় পাবেন? শুনেছি, সেইসব ঠিকাদারদের টাকার ভাগ আপনার কাছেও আসে। ভুল হলে মাপ করবেন।

আরও একটা প্রশ্ন। তিনটে নাম বলছি। যারা ঠিকাদারি করেই খান। রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, সব্যসাচী দত্ত এবং অর্জুন সিংহ। এঁরা সকলেই আপনার হাত ধরে তৃণমূলে ফিরেছেন। আমি মনে করি না সৎ পথে ঠিকাদারি কোনো অন্যায়। নির্বাচন কমিশনের নিয়মেও ঠিকাদাররা ভোটে দাঁড়াতে পারবেন না এমন বলা নেই। খালি পঞ্চায়েত বা জেলা পরিষদের কোনো কাজ করার সময় সংশ্লিষ্ট এলাকায় ভোটে লড়ায় বাধা রয়েছে। তবে সেটাও স্ত্রী বা শ্যালকের নামে কাজ হলে অসুবিধা নেই। আবার স্ত্রীকে জিতিয়ে স্বামী হিসাবে কাজ চালানোতে কোনো বাধা নেই।

এই যাহ্। মূল প্রশ্ন থেকেই সরে গেলাম। শুনেছি, বিজেপিতে আসার পরে রাজীব, সব্যসাচী, অর্জুনরা নিজেদের ঠিকাদারি ব্যবসাটা চালাতে পারছিলেন না। এখন ফিরে গিয়েছেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, ওঁদের ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি হোক। কর্মসংস্থান হোক। সঙ্গে তৃণমূলের অর্থ সংস্থান হোক। □

অতিথি কলম

চিদানন্দ রাজঘাটা

দাসপ্রথার সময়কার হিংস্র অস্ত্র আইনই চালু রাখতে চায় শ্বেতাঙ্গ মহিলারা

অতি সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঞ্চলের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক খুনে মানসিকতার ১৮ বছরের ছেলে ঢুকে পড়ে অবাধে ১৯ জন শিশুকে গুলি করে মেরেছে। তার বাড়িতে মানুষমারা বন্দুকের কোনো অভাব ছিল না। এই ঘৃণ্য কাজটি করার আগে সে তার নিজের ঠাকুমাকেও গুলি করে বেরিয়েছিল। শিশুগুলির মৃত্যুর পর পুলিশ তাকে ধাওয়া করে মেরেছে। এমন শিশুহত্যার খবর আমেরিকা থেকে প্রায়শই পাওয়া যায়।

এই ঘটনাগুলি সামনে না এলে সচরাচর মার্কিন দেশ নিয়ে খুবই গালভরা কথা চালাচালি হয়। সেখানকার রাজনীতিবিদ ও মানুষজনের পারস্পরিক সৌজন্যবোধও অতিমাত্রায় পরিশীলিত ব্যবহারের বাড়বাড়ন্ত দেখা যায়। সেখানকার প্রত্যেকটি প্রদেশের আইন প্রণয়নকারীরাই মহান ও ভদ্র। তাদের নিজস্ব প্রদেশগুলি ও মানুষজনও তদনুরূপ। মার্কিন সেনেটর ও কংগ্রেসের রিপ্রেজেন্টেটিভরা প্রায় বাধ্যতামূলকভাবে একে অপরকে 'হে ভদ্রজন বা হে ভদ্রমহোদয়া' ছাড়া বলেন না। কেননা তাঁরা সকলেই এক একটি মহান প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন। এখানে তাঁরা প্রদেশের কোনো গুণগত বা সংখ্যাগত মানের বাছবিচার করেন না। যেমন ধরুন, 'রোডস আইল্যান্ড' বা দরিদ্রতম রাজ্য 'মিসিসিপি' বা সেই হিসেবে শিক্ষামানে সব থেকে অশিক্ষিত 'পশ্চিম ভার্জিনিয়া' —সকলের সঙ্গেই ব্যবহার বা সম্ভাষণে কোনো তারতম্য হয় না। এই ব্যবহারিক শিষ্টাচার ও সম্ভ্রমের প্রকাশ সরকারের অন্যান্য শাখাতেও প্রয়োগ করা হয়। যেমন ধরুন সাদা চামড়ার গরিষ্ঠতা সম্পন্ন আইন প্রয়োগকারীরা বা পুলিশবাহিনী। এঁরা বহু কুকীর্তির অধিকারী হলেও ও প্রায় সামরিকীকরণের কায়দায় গঠিত হলেও হিংস্র ও কুখ্যাত অপরাধী ও আইনভঙ্গকারীকেও তাঁরা সর্বদা হ্যালো স্যার বলেই সম্বোধন করে থাকেন।

কিন্তু দেশটির দীর্ঘলালিত রাজনৈতিক শিষ্টাচার অতি দ্রুত উধাও হয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক একটি সাংবাদিক সম্মেলনে উল্লেখিত টেক্সাস প্রদেশের হিংসাকবলিত উভেনদ অঞ্চলের ঘোর খোলা ক্যামেরার সামনে ওই ঘটনায় যুক্ত ব্যক্তির ও পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল এমন একজন বিরোধী রাজনীতিবিদকে মুখে আনা যাবে না এমন কুৎসিত ভাষায় গালিগালজ করেছেন। টেক্সাসের এই শহরটি চিরকালের জন্য ইতিহাসে ১৯টি শিশুখুনের কুশ্রী অপবাদ বয়ে বেড়াবে। সেখানকার উল্লেখিত মেয়র কিন্তু যে রাজনৈতিক বিরোধীটি এই বন্দুক রাখার খোলা লাইসেন্স দেওয়া নিয়ে অভিযোগ তুলেছিলেন তাঁকেই ওই নোংরা গালাগালগুলি দেন।

মনে রাখতে হবে, আমেরিকা এমন একটা দেশ যা অভিবাসীদের বসতের ফলেই বেড়ে উঠেছে এবং জনসংখ্যার চরিত্র পালটে চলেছে। সেই কারণে এটা খুবই স্বাভাবিক যে অদূর ভবিষ্যতে অলঙ্ঘনীয়ভাবে সাদা চামড়ার মেজরিটি মানুষজন মাইনরিটিতে পরিণত হবেন।

আরও একজন ডেমোক্র্যাট সদস্য তাঁর এক রিপাবলিকান সহকর্মীকে বলেন নিজের বাড়িতে গিয়ে নিজের লজ্জাস্থানে গুলি চালাও আর ওই হতভাগ্য নিহতদের কথা ভেবে একটু প্রার্থনা করা অভ্যাস করো। সাম্প্রতিক এত বড়ো আকারের বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে হত্যা ঘটনার পর কী ডেমোক্র্যাট কী রিপাবলিকান যারা বন্দুক রাখার অধিকার নিয়ে ভিন্ন মতাবলম্বী তারা একে অপরকে সেই 'হ্যালো' স্যার 'ম্যাডাম' ভুলে অতি নিম্নভাষায় কুৎসিত গালিগালাজ করছেন। সব মুখোশ খসে গেছে। আজকের আমেরিকা মতপোষণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিভক্ত এবং যে দেশের রাজনীতিও ক্রম ভঙ্গুর। বিষয়টি এখন নজরে আসছে। বিশেষ করে এই সাম্প্রতিক শিশুমেধ যজ্ঞের পর সেই বিভেদ একেবারেই উলঙ্গ হয়ে পারস্পরিক রাজনৈতিক সংহারের চেহারা নিচ্ছে।

এই সূত্রে নির্বাচন ও বিভিন্ন সমীক্ষায় যে তথ্য উঠে এসেছে তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ আমেরিকানরা বন্দুকের অধিকারের ওপর নিয়ন্ত্রণ চান। এই সাম্প্রতিক হত্যালীলার আগেও একটি এই সংক্রান্ত ভোটাভুটিতে ৫৯ শতাংশ মার্কিনি বন্দুক নিয়ন্ত্রণের ওপর কড়া আইনের পক্ষপাতী। তাঁরা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কালবিলম্ব না করে আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করতে বলেন। ৩২ শতাংশ এই মতের বিরোধিতা করেন। স্বাভাবিকভাবে গরিষ্ঠাংশের মতবাদকে মর্যাদা দিয়ে হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ যাঁরা জনসংখ্যা অনুযায়ী সমানুপাতিকহারে জনতার ভোটে নির্বাচিত হন তাঁরা চটজলদি 'বন্দুকের অবাধ অধিকার' ছেঁটে বন্দুক নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ করে ফেলেন। অতীতেও গরিষ্ঠাংশ ক্ষেত্রেই এমন সব সংশোধিত আইন প্রয়োগের আগেই মারা গেছে। এগুলিকে মেরেছেন জনসংখ্যার

অনুপাতের সঙ্গে কোনো সাযুজ্য না থাকা সেনেটে সদস্যরা। এঁরা শুধুমাত্র মারণাস্ত্র নিয়ন্ত্রণ নয়, আমেরিকার বহু আইনকেই তাঁদের বন্দি বানিয়ে রেখেছেন।

সকলের জানা উচিত এই মার্কিন সেনেট হলো একটি প্রাচীন সাদা চামড়ার আমেরিকানদের কুক্ষিগত পীঠস্থান (চেম্বার)। এখানে বর্তমান যুগে একেবারেই খাপ খায় না এমন সব প্রাচীন আমেরিকান ধ্যান ধারণা পোষণ করা লোকেদের ভিড়। সংখ্যার হিসেবে বর্তমানে ১০০ সেনেটরদের মধ্যে মহিলা ও সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি সংখ্যা এক চতুর্থাংশের বেশি হলেও প্রাচীন ধারণা পোষণকারী রক্ষণশীল সাদা চামড়ারাই এই সেনেটে দাপট দেখান ও নিজেদের মত অনুযায়ী পরিচালনা করেন।

মার্কিনি নিয়ম অনুযায়ী জনসংখ্যা যাই হোক না কেন প্রতিটি প্রদেশ পিছু ২ জন করে সেনেটর পাঠানো হয়। ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানরা আজকে সেনেটে সংখ্যায় ৫০-৫০ হয়ে আছেন। ৫০ জন রিপাবলিকান (ডোনাল্ড ট্রাম্পের দল) সেনেটর যাঁরা অধিকাংশই কম জনসংখ্যার কিন্তু বেশি সংখ্যক সাদা চামড়ার আমেরিকায় বসবাসকারী মূলত মধ্য আমেরিকা থেকে যান। এই সেনেটররা শতাংশের অনুপাতে ৪৩.৫ শতাংশ জনসংখ্যার (অনির্বাচিত) প্রতিনিধিত্ব করেন। অন্যদিকে ৫০ জন ডেমোক্র্যাট (বাইডেনের দল) জনসংখ্যার ৫৬.৫ শতাংশের প্রতিনিধি হিসেবে সেনেটর হন। উল্লেখ্য সেনেটে সেই ১৯৯৬ সালের পর থেকে রিপাবলিকান সেনেটররা কখনই নাগরিকদের গরিষ্ঠাংশের প্রতিনিধিত্ব করেননি।

কিন্তু মার্কিনি সেনেটকে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অনুমোদন দিতে হয়। এর মধ্যে বহু গুরুত্বপূর্ণ আইন ও বিচারক থেকে দেশে দেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করার বিষয়ও থাকে। কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠ আমেরিকানদের প্রতিনিধিত্ব করা রিপাবলিকান সেনেটররা প্রায়শই আইন প্রণেতাদের (মার্কিন রাষ্ট্রপতি-সহ) ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিফলিত হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ (যেখানে এখন বাইডেনের ডেমোক্র্যাটরা সংখ্যাগরিষ্ঠ) তাদেরকে প্রায়শই প্রাচীরের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। আইন কার্যকর করতে দেয় না। উদাহরণ স্বরূপ বন্দুক আইনে সংশোধন থেকে বিদেশি অভিবাসন, গর্ভপাত থেকে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ এমনি আরও বহু ক্ষেত্রেই কম জনসংখ্যার বিশাল মনুষ্যবর্জিত অঞ্চল থেকে অনির্বাচিত রক্ষণশীল প্রাচীন আমেরিকান-গর্ব বহনকারী সাদা চামড়ার সংখ্যালঘু রিপাবলিকানরাই কলকাঠি নাড়েন।

তাঁদের অব্যর্থ কৌশলে আমেরিকার সর্বোচ্চ আদালতে এখন বিচারকদের সংখ্যায় রক্ষণশীলরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কেননা তাদের নিয়োগও সেনেট থেকে অনুমোদিত হতে হবে। এর প্রমাণও সাদা চামড়ার প্রাচীন ধারণার রিপাবলিকানরা হাতেনাতে দিয়েছেন। তাঁরা দেশে দেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ আটকে দিয়েছেন। সদ্য সদ্য বাইডেনের মনোনীত নয়া দিল্লির জন্য নির্ধারিত রাষ্ট্রদূতের মনোনয়নও নামঞ্জুর হয়েছে। বাস্তব পরিস্থিতিটা দাঁড়িয়েছে দেশ পরিচালনা আটকে দিতে গেলে হয় সেনেটে জিততে হবে কিংবা নিদেনপক্ষে 'টাই' হলেও চলবে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত গরিষ্ঠাংশের প্রতিনিধিরা ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে যেতে পারেন।

এখানে একটু প্রাচীন ইতিহাস ছুঁয়ে যেতে হবে। সাদা চামড়ার আধিপত্যবহুল সেনেটের বন্দুক নিয়ন্ত্রণ আইন বাতিল করার মূলে রয়েছে আমেরিকান সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর ওপর প্রবল প্রেম। এখানে খোলাখুলি একজন আমেরিকানকে বন্দুক রাখার অধিকার দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ ২৩০ বছর আগে ক্রীতদাস প্রথার আমলে জেমস ম্যাডিসন নামে এক আইনবেত্তা তাঁর ধারণা অনুযায়ী বলেছেন দেশে একটি নাগরিক সেনাবাহিনী তৈরি রাখতে হবে যাতে কখনও অত্যাচারী যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সঠিক মোকাবিলা করা যায়। সেই আইনটি প্রায় অসম্পূর্ণ ও বৈপরীত্যমূলক শব্দে ভর্তি। 'একটি সুনিয়ন্ত্রিত আধাসামরিক নাগরিক বাহিনী যারা মুক্ত ও অবাধ দেশের অস্তিত্ব নিশ্চিত করবে যে কারণে জনগণের বন্দুক রাখার অধিকার কেউ হরণ করতে পারবে না।'

রক্ষণশীলদের মতে এখানে খোলাখুলি ও বিধিনিষেধ ছাড়াই জনগণকে বন্দুক রাখার অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু 'সুনিয়ন্ত্রিত' কথার তাৎপর্য কী? এর অর্থ এই যে অস্ত্র রাখার অধিকার বাধাবন্ধহীন কখনই নয়। আর একথা বলাই বাহুল্য যে আইনটি তৈরি হয়েছিল ১৭৯১ সালে যখন দাসপ্রভুরা অকাতরে বন্দুক চালিয়ে ক্রীতদাস হত্যা করতেন। ওরা তখন মেয়েদের ভোটাধিকার পর্যন্ত দেননি। ইতিমধ্যে অস্ত্রে বিভিন্ন 'গঠনের' মধ্যেও অনেক পরিবর্তন হয়েছে এমন গণহত্যাকারীদের বিশেষ পছন্দের ব্র্যান্ড এআর-১৫। এই বন্দুকে ১ মিনিটে ১০০ রাউন্ড গুলি ছোঁড়া যায়। ভয়ংকর। মানুষ মারার এমন আতঙ্ক উদ্রেককারী যন্ত্র বাজারে চলে এলেও রক্ষণশীল কট্টর সাদা আমেরিকানরা এখনও কিন্তু ওই দ্বিতীয় সংবিধান সংশোধনীকেই শেষ কথা বলে মানেন। একই সঙ্গে আগে বলা সর্বোচ্চ আদালতটি তাঁদের সমমনস্ক বিচারক দিয়ে ভরিয়ে রেখে দেওয়ার ফলে এই বন্দুক আইন সংশোধন তাঁরা যুগ যুগ ধরে আটকে রাখতে পারেন।

আরও একটি অতি সহজ ব্যাখ্যাও দক্ষিণপন্থী রিপাবলিকানদের আছে অস্ত্র রাখার পক্ষে। এ বিষয়টা আরও প্রকটভাবে সামনে এল গত সপ্তাহের সুপার মার্কেটে গোলাবাজিতে। বাফেলোতে একজন সাদা আমেরিকান যিনি নিজেদের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবেন অকাতরে গুলি চালিয়ে ১০ জন কালো চামড়ার মানুষকে মেরে ফেললেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন এরা অভিবাসী ও সংখ্যালঘু আর এঁরাই সাদা চামড়ার মার্কিনিদের ওপর আধিপত্য করতে চলেছে। এটি ওদেশে চক্রান্তকারী 'রিপ্লেসমেন্ট থিয়োরি' নামে পরিচিত। মানে কালোরা সাদাদের হটিয়ে দেবে।

মনে রাখতে হবে, আমেরিকা এমন একটা দেশ যা অভিবাসীদের বসতের ফলেই বেড়ে উঠেছে এবং জনসংখ্যার চরিত্র পালটে চলেছে। সেই কারণে এটা খুবই স্বাভাবিক যে অদূর ভবিষ্যতে অলঙ্ঘনীয়ভাবে সাদা চামড়ার মেজরিটি মানুষজন মাইনরিটিতে পরিণত হবেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে সেনেটের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম রেখে (যা অচিরেই দ্বিতীয় সংশোধনীর সঙ্গে সংশোধিত বা বিলোপ করা উচিত) কালো আমেরিকানদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার মাধ্যমে নির্বাচনী রায় চুরি করে ক্ষমতায় থাকতে গেলে সেই ক্ষমতা কেবল বন্দুকের নলের জোরেই পাওয়া যাবে। সেই কারণে দ্বিতীয় সংশোধনী ধামাচাপা দিয়ে রাখতেই সেনেটের রক্ষণশীলরা তৎপর।

(লেখক ওয়াশিংটন নিবাসী রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

বিচারব্যবস্থার ওপর আক্রমণ আমাদের গণতন্ত্রকেই সংকটগ্রস্ত করছে

তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি পূর্ব মেদিনীপুরের এক জনসভায় বক্তব্য রাখার সময় রাজ্যের বিচারব্যবস্থাকে কটাক্ষ করেছেন। বিচারব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত দু'একজনকে তিনি তল্পিবাহক আখ্যা দিয়েছেন। তাঁরা কেন তল্পিবাহক তারও ব্যাখ্যা দিয়ে অতঃপর অভিষেকের মন্তব্য, কিছু হলেই সিবিআই দেওয়া হচ্ছে, খুনের মামলায় স্থগিতদেশ দেওয়া হচ্ছে ইত্যাদি। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির এই মন্তব্য প্রসঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে, স্বতঃপ্রণোদিত মামলার হাত থেকে ডিভিশন বেঞ্চ অভিষেককে রেহাই দিলেও জনস্বার্থের কথা মাথায় রেখে তাঁকে সতর্কও করেছে। রাজ্যের মহামহিম রাজ্যপালও তাঁকে সীমারেখা মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু কথায় বলে, 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি'। অভিষেকের রাগটা কার ওপর তা না বলে দিলেও চলে। সম্প্রতি রাজ্যের শিক্ষা-দুর্নীতির হিমশৈলের চূড়ামাত্র সামনে এসেছে এবং তাতে খোদ প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী তথা রাজ্যের শাসকদলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা ও রাজ্যের বর্তমান শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর জড়িত থাকার কথা প্রকাশ্যে আনতে কলকাতা হাইকোর্টের ভূমিকা অভিনন্দনযোগ্য। এই দুর্নীতির শিকড় ঠিক কতটা গভীরে তা পরিমাপ করার জন্য বিচরপতি সিবিআই তদন্তেরও নির্দেশ দিয়েছেন। তবে দুর্নীতির পরিমাপ দেখে বিস্মিত বিচারপতি নৈতিকতার খাতিরে উক্ত মন্ত্রীদের পদত্যাগের কথা বলেছিলেন। যদিও পরে ডিভিশন বিচারপতির এই মন্তব্যকে 'আবেগপ্রবণ' বলে চিহ্নিত করে আদালতের সীমারেখাটুকু অন্তত নির্দেশ করেছে।

এখন প্রশ্ন, হলদিয়ার মাটিতে দাঁড়িয়ে আদালতকে আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিলেন কেন তিনি? এটা কী নেহাতই কাকতলীয় ঘটনা নাকি অন্য কিছু? এই রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিসর যে ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে, সেটা আর কোনো গোপনীয় ব্যাপার নয়। এরাজ্যে নির্বাচন-পরবর্তী হিংসার যে কদর্য চিত্র দেখা গিয়েছে, তাতেই মালুম এ রাজ্যের সরকার দেশের গণতন্ত্রের প্রতি কতটা আস্থাশীল। প্রতিনিয়ত দেশের সংবিধানকে এরাজ্যে যেভাবে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে, তাতে ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থার কথা মনে পড়তে বাধ্য। সব কিছুর রাজনীতিকরণ, বিরোধীদের কথা বলার সুযোগ না দেওয়া, সবশেষে বিরোধী রাজনীতির পরিসরকেই নিজের দলের আঙিনায় টেনে আনার বাসনা অর্থাৎ এককথায় ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে পঙ্গু করে দেবার বাসনায় এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সক্রিয়। এর আগের মেয়াদেও আমরা দেখেছি, একের পর এক বিরোধী বিধায়ককে প্রলোভন, ভয় ইত্যাদি দেখিয়ে শাসকদল নিজেদের দিকে টেনে এনে নাম কা ওয়াস্তে বিধানসভায় বিরোধী দলের পাঁচ বিধায়ককে ভাঙিয়েও নেয়। কিন্তু বর্তমান বিরোধী দলনেতা আদালতের দ্বারস্থ হওয়ায় গত মেয়াদের পরিকল্পনা এবার খাটাতে ব্যর্থ হয়েছে রাজ্যের শাসক দল। সৌজন্যে মূলত বিরোধী দলনেতা। তিনিই এ ব্যাপারে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ায় বিরোধী দল ছেড়ে শাসক শিবিরের খাতায় নাম লেখানোর পরও উক্ত পাঁচ বিধায়ক বিধানসভার সদস্যপদ যাবার ভয়ে তারা এখনো বিরোধী দলে বলেই, হাস্যকর হলেও সেই দাবি করেছেন। এর পেছনে বিচারব্যবস্থার সক্রিয় ভূমিকার কথা অবশ্যস্বীকার্য।

সেই কারণে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সম্পাদকের রাগ মূলত বিরোধী দলনেতার ওপর এবং সেই রাগের বহিঃপ্রকাশের স্থান ও পাত্র হিসেবে তিনি রাজ্যের বিরোধী দলনেতার নিজের জেলাকে (পড়ুন পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়া) বেছে নিয়েছেন ও বিচারব্যবস্থার ওপর ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। এই প্রবণতার জন্য শুধু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে একা দায়ী করলে ভুল হবে। এই প্রবণতা এখন আগমার্কা দেশের বিরোধী রাজনীতিরই। নির্বাচনে তো বটেই, নীতির প্রশ্নে হেরে গিয়ে বিশেষত, মন্দির-মসজিদ প্রশ্নে আদলতে বিফল হয়ে বিরোধীরা মোদী-সরকার বিচারব্যবস্থা কিনে নিয়েছে বলে হল্লা করছে। এটা অনেকটা ইভিএমের মতো ব্যাপার। বিরোধীরা জিতলে ইভিএম খুব ভালো আর হারলেই শাসক দলের (পড়ুন বিজেপি) হয়ে নির্বাচন কমিশন কারচুপি করেছে। ঠিক যেমন, আদালতে মামলায় জিতলে বা নীতির প্রশ্নে বিরোধীদের পক্ষে রায় গেলে যেমন কিছুদিন আগেই সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ প্রশ্ন তুলেছিল, ব্রিটিশ আমলের রাষ্ট্রদ্রোহিতা আইন এখনো ভারতে বলবৎ থাকার যৌক্তিকতা কী? তখন কিন্তু বিরোধীরা দেশের বিচারব্যবস্থার প্রতি অচলাভক্তি দেখিয়েছিল। আর আদালতে পর্যুদস্ত হলেই সেটা হয়ে যায় বিজেপির বিচারব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করা। বিরোধীদের এই অগণতান্ত্রিক মনস্তত্ত্ব, সুবিধাবাদী মনোভাব যে দেশের গণতন্ত্রের পক্ষে, সংবিধানের পক্ষে বিপজ্জনক তা বলাই বাহুল্য, সাম্প্রতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তা আরও একবার প্রমাণিত হলো। যে কোনো গণতন্ত্র শক্তিশালী হয় বিরোধীদের পরিসর প্রশস্ত হলে। কিন্তু বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রে বিরোধীদের পরিসর ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে, বিচারব্যবস্থার প্রতি বিরোধীদের এই অসংযত, অনভিপ্রেত আক্রমণের ফলে। বিরোধীদের এই অবস্থার জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। □

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা দপ্তরে মাৎস্যন্যায়

শিক্ষাঙ্গনে দলদাস ছাত্র নামধারী সমাজবিরোধীদের হুংকার, অনলাইন পরীক্ষার নামে গণটোকাটুকির সুযোগ চালু রাখা, রাজনৈতিক স্বার্থে পাঠ্যক্রম তৈরি, শিক্ষকতার নামে শুধুই রাজনীতি আর শিক্ষাঙ্গনের উন্নয়নের নামে ঠিকাদারদের থেকে কাটমানি সংগ্রহ।

ড. নারায়ণ চক্রবর্তী

কথায় আছে, একটি জাতিকে ধ্বংস করতে হলে যুদ্ধ নয়, তার শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দাও, তাহলেই সেই জাতি ধ্বংস হবে। এই কথার গুরুত্ব বুঝেই ভারতের ক্ষতিসাধনে উৎসুক বিদেশি শক্তি, যারা আবার ভারতীয় কমিউনিস্টদের গডফাদারও বটে। তাদের অঙ্গুলি হেলনে ও কেন্দ্রের পরিবারকেন্দ্রিক সরকারের সহযোগিতায় ভারতের শিক্ষা জগতের সকল দায়িত্ব দেওয়া হলো দেশের কমিউনিস্টদের! যে কটি নতুন কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হলো,সবকটি জাতীয়তাবিরোধী এবং জেহাদিদের আঁতুড়ঘর হিসেবে কাজ করতে লাগল! গভর্নিং বডি থেকে শিক্ষক নির্বাচন, প্রমোশান, ছাত্রভর্তি, সিলেবাস তৈরি— সকল ক্ষেত্রেই এদের মানসিকতা প্রতিফলিত হলো। এই কমিউনিস্টদের মধ্যে বড়ো সংখ্যক মানুষ পশ্চিমবঙ্গের হওয়ায় এবং পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ সময় বামফ্রন্টের আড়ালে সিপিএমের শাসন কায়েম থাকায়, শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয়তা-বিরোধী চিন্তা, জেহাদিদের সমর্থনকারী চিন্তাধারার স্ফুরণ শুরু হলো। শিক্ষক চয়নের ক্ষেত্রে মেধার বদলে কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসীদের শিক্ষক হিসেবে নেওয়া হলো! শিক্ষক চয়নে দলদাস প্রথা একমাত্র প্রাধান্য পেল। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে, আলিমুদ্দিনের অদৃশ্য সিভি যদি বিবেচিত হতো তাহলেই বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হওয়া যেত! ক্রমে তা স্কুল পর্যায়েও ছড়িয়ে পড়ল। প্রধান শিক্ষক, প্রিন্সিপাল ও উপাচার্য চয়নেও আলিমুদ্দিনের সবুজ সংকেতের কথা তখন সবাই জানত। ফলে, যারা এসব পদের প্রার্থী হতে আকাঙ্ক্ষা করতেন, তাঁরা 'আগে কেবা প্রাণ, করিবেক দান' গোছের পার্টিঅন্ত প্রাণ বা আগমার্কা কমিউনিস্টের ভেক ধরে কাজ হাসিল করতে চাইতেন!

২০১১ সালে পরিবর্তনের নামে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতার সিংহাসনে বসলেন 'সিপিএমের মেধাবী ছাত্রী' মমতা ব্যানার্জি। তিনি ক্ষমতায় এসেই 'টাকা নাই' আর 'কেন্দ্র দেয় না' গোছের সিপিএম মার্কা অজুহাতগুলি সামনে রেখে সরকার চালাতে শুরু করলেন। দশ বছর পর তাঁর সরকারের দুর্নীতিগুলি প্রকাশ্যে আসতে শুরু করল। সিপিএম শিক্ষা দপ্তরকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করলেও ব্যক্তিগত অর্থ উপার্জনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেনি। কিন্তু ওই যে 'মেধাবী ছাত্রী'— তিনি তো গুরুকেও ছাপিয়ে যাবেন, আর সেটাই তো স্বাভাবিক। শিক্ষা দপ্তর থেকে অর্থ উপার্জনের নতুন নতুন টেকনিক আবিষ্কার হলো! এটি সম্ভব হলো দুটি কারণে, প্রকৃত শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য মানুষদের দায়িত্বে শিক্ষা দপ্তরকে আনা এবং দ্বিতীয় কারণ অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের শিক্ষার রাজনীতিকরণের সঙ্গে পরিচিতি থাকায় এই বিষয়ে তাদের অনাগ্রহের কারণে দুর্নীতির নতুন নতুন টেকনিকের প্রয়োগ!

২০১৬ সালের নির্বাচনে জেতার পর মমতা ব্যানার্জি শিক্ষামন্ত্রী করে আনলেন শিল্পমন্ত্রী হিসেবে চূড়ান্ত অকৃতকার্য এবং নিজের ডক্টরেট ডিগ্রির থিসিস প্লেগিয়ারিজমের অভিযোগে অভিযুক্ত পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। এর থেকেই বোঝা যায় মুখ্যমন্ত্রীর শিক্ষাদপ্তর থেকে প্রত্যাশা কী ছিল!

শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব নিয়ে পার্থবাবু উন্নয়নের বন্যা বইয়ে দিলেন! এমনকী, রাজ্যের প্রত্যন্ত জায়গায় বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় বানানোর হিড়িক পড়ে গেল! নির্মাণের কন্ট্রাক্ট পাওয়া ঠিকাদাররা সুদৃশ্য নির্মাণ শুরু করলেন— ঢক্কানিনাদে শিক্ষার উন্নয়ন ঘোষিত হলো! মোসাহেব ও অর্ধশিক্ষিত পেড 'বুদ্ধিজীবী'র দল উদ্বাহু হয়ে নৃত্য শুরু করল! নতুন এইসব শিক্ষায়তন দূরের কথা, যেসব শিক্ষায়তন আগে থেকেই চলছে, তাদের পরিকাঠামোর অবস্থা সরকারের পর্যাপ্ত অর্থ না দেওয়ার কারণে ধুঁকছে। ফলে, জোড়াতালি দিয়ে এই শিক্ষায়তনগুলি চালু করলেও এদের শোচনীয় পরিকাঠামোর কারণে শিক্ষার মানের সঙ্গে সমঝোতা করতে হচ্ছে।

এরপর আসে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগের প্রশ্ন। এখানে মন্ত্রী মহোদয় প্রবল শক্তিশালী উচ্চ পর্যায়ের কমিটি তৈরি করলেন এবং নিয়োগ সংক্রান্ত যে কমিশনগুলি আছে, তার উচ্চপদে কিছু পছন্দমতো মানুষকে নিয়োগ করলেন! এই কমিটিতে মন্ত্রী মহোদয়ের ওএসডি-কেও তিনি সদস্য করলেন! তাঁরা এমন কাজ করলেন যে, বাগ কমিটির সুপারিশে ও মহামান্য হাইকোর্টের আদেশে তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই এই কমিটির চেয়ারম্যান শান্তিপ্রসাদ সিনহা-সহ মাধ্যমিক বোর্ডের সভাপতি কল্যাণময় গাঙ্গুলি, সৌমিত্র সরকার, সমরজিৎ আচার্য ও অশোক কুমার সাহার বিরুদ্ধে পুলিশে এফআইআর দায়ের করেছে। এছাড়া, বাগ কমিটি বিভাগীয় তদন্তের সুপারিশ করেছে, সুবীরেশ ভট্টাচার্য, চৈতালী

ফঃ ২

ভট্টাচার্য, শর্মিলা মিত্র, মহুয়া বিশ্বাস, শেখ সিরাজউদ্দিন ও শুভাশিস চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে! এই মন্ত্রীকৃত কমিটি ও বোর্ড যোগ্যতামানের এবং পরীক্ষার নম্বরের তোয়াক্কা না করে গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি-র কর্মী নিয়োগে পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি করছে। চাকরি পাওয়া ৩৮১ জন প্রার্থীর মধ্যে ২২২ জন পরীক্ষাতেই বসেনি। আর ১৫৯ জন মেধা তালিকার নীচের দিকে থাকায় তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরি পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। আবার মেধা তালিকায় নাম থাকলেও ৬৫০০ জনের চাকরি হয়নি। উচ্চ-প্রাথমিক, নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগে ব্যাপক হারে দুর্নীতি হয়েছে। গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি-র নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়মের জেরে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশে ৫৪২ জনের বেতন বন্ধ হয়েছে।

সুতরাং দপ্তরের দুর্নীতি সর্বব্যাপ্ত। fountain of corruption- এর শিখরে আছেন পরম ব্রহ্মরূপী দপ্তরের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়! কারণ এই মন্ত্রীর নির্দেশেই এফআইআর-এ নাম থাকা বিদ্বজ্জনরা (দুর্জনে বলে দালালরা) সকলেই তাঁদের নিয়োগপত্র পান! স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, তাহলে কি শিক্ষা দপ্তরকে ব্যবহার করে এই পাহাড়-প্রমাণ দুর্নীতি সংঘটিত হয়েছে? কেন? এর সোজা উত্তর, আর্থিক লেনদেন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে তৃণমূল দলেরই প্রাক্তন মন্ত্রী তথা প্রাক্তন সিবিআই আধিকারিকের অভিযোগ— লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে এইসব সরকারি চাকরি বিক্রি করা হয়েছে। এখানে দুটি কথা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। প্রথম হচ্ছে, মন্ত্রী এসবের কিছু জানতেন না— একথা একদম অবিশ্বাস্য। তাহলে বলতে হয় এই রকম অযোগ্য মন্ত্রী পৃথিবীতে কখনো কেউ দেখেনি। দ্বিতীয় হচ্ছে, যিনি ভোটপর্বে সবসময় বলতেন, '২৯৪টা সিটে আমিই প্রার্থী' অর্থাৎ তাঁকে দেখেই সবাই তাঁর দলের প্রার্থীকে ভোট দেবেন; এবং যাঁর অনুপ্রেরণা ছাড়া যে সরকারের কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় না— সেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এই দুর্নীতির কিছুই জানতেন না, একথা হাস্যকর শোনাবে। সেজন্য সিবিআই একাধিকবার পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। যে টাকা দুর্নীতিতে তোলা হয়েছে তার হদিশ খুঁজলেই আসল মাথাদের খোঁজ মিলবে। সিবিআই একাজে ব্যর্থ হলে কিন্তু সেটিং তত্ত্বের বাতাস গতি পাবে।

শিক্ষা দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারীর কথাও বলা দরকার। এই স্বনামধন্য (!) মন্ত্রী মহোদয়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্কুল লেভেলেই সমাপ্ত হয়েছে! এরকম মানুষকে যিনি শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রিত্বে চয়ন করেন তাঁর উদ্দেশ্য শিক্ষার বিকাশ সাধন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। এই তালেবর মন্ত্রীর কন্যা অঙ্কিতা অধিকারী একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে শিক্ষিকা নিয়োগের পরীক্ষায় ৬১ নম্বর পেয়ে ইন্টারভিউতে কোনো ডাক পাননি। অথচ অন্য একজন চাকরি প্রার্থী ববিতা বর্মন একই পরীক্ষায় ৬৯ নম্বর পেয়ে মোট ৭৭ নম্বর পাওয়ায় নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধার ভিত্তিতে প্রথম স্থানে থাকেন। যখন চাকরি প্রাপকদের তালিকা প্রকাশ করা হয়, দেখা যায়, অঙ্কিতা অধিকারী প্রথম এবং ববিতা বর্মন ওয়েটিং লিস্টে। মন্ত্রী-কন্যা নিয়োগপত্র পাবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির পাশের সরকার পোষিত স্কুলে শিক্ষিকা হিসেবে যোগদান করেন। হাইকোর্টে করা ববিতা বর্মনের মামলায় এসব তথ্য প্রকাশ্যে আসে। এসএসসি-র চেয়ারম্যানকে মহামান্য বিচারক তথ্য দিতে বলায় চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার এই তথ্য হাইকোর্টে পেশ করেন। ফলে হাইকোর্ট অঙ্কিতাকে বেআইনি নিয়োগের কারণে বরখাস্ত করার আদেশ দেন। এদিকে এই ঘটনার পরেই সিদ্ধার্থ মজুমদার তাঁর পদ থেকে অব্যাহতি নেন! এর থেকে বোঝা যায় যে দুর্নীতির উন্মোচন করতে যিনি সহায়তা করবেন, এ রাজ্যের প্রশাসনে তাঁর কোনো স্থান নেই। এই পরেশবাবুকে তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠালে তিনি সকন্যা পদাতিক এক্সপ্রেসে চেপে কলকাতায় আসার বদলে মাঝরাস্তায় 'নিখোঁজ' হয়ে যান। তারপর হয়তো মহামান্য আদালতের কড়া পদক্ষেপের ভয়ে তিনি একদিন পর সিবিআইয়ের দপ্তরে হাজির হন। শিক্ষা দপ্তরের দুই মন্ত্রীকেই তদন্ত চলার সময় মহামান্য আদালত সরিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এটি শোভনভাবে দেওয়া পরামর্শ-আদেশ নয়। সুতরাং মুখ্যমন্ত্রী এই পরামর্শ মানতে বাধ্য নন। তিনি তা মানেননি। মন্ত্রীসভার অন্যতম সিনিয়ার সদস্য ফিরহাদ হাকিম মন্তব্য করেছেন, 'পার্থদা দায়ী হলে আমরাও দায়ী' অর্থাৎ উনি সঠিকভাবেই মন্ত্রীসভার যৌথ দায়িত্বের কথা বলেছেন। যৌথ দায়িত্ব থাকলে এই দুর্নীতির কাদা কি মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্য, এমনকী মুখ্যমন্ত্রীর গায়েও লাগবে না? তদন্তকারী সংস্থা মন্ত্রীর বানানো কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির জন্য এফআইআর করেছে; মন্ত্রীকে একাধিকবার জিজ্ঞাসাবাদ করছে--- যা আটকানোর জন্য মন্ত্রী যতরকম সম্ভব, ততরকম ভাবে পদক্ষেপ করছেন। আর এক মন্ত্রীর দেশসেবা নিজের পরিবারকে সেবা এবং অন্যদের অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করার মাধ্যমেই স্ফুরিত হয়েছে— এই অভিযোগে তিনি সিবিআই-এর জিজ্ঞাসাববাদের মুখোমুখি। এদের মন্ত্রীসভায় রেখে দেওয়া আইনত ঠিক হলেও কতটা শোভন? অবশ্য দু'কান কাটা মানুষ শোভনীয়তার ধার ধারেন না। তবে, এই পদক্ষেপের পর সন্দেহের তির মন্ত্রীসভা-সহ মুখ্যমন্ত্রীর দিকে যে থাকবে তা বলাই বাহুল্য। তথাকথিত 'সেটিং তত্ত্ব' মিথ্যা প্রমাণের দায় এখন সিবিআই-এর উপর! পশ্চিমবঙ্গের অগণিত শিক্ষিত বেকারকে বঞ্চিত করে যারা অসৎ উপায়ে শিক্ষার পরিকাঠামোকেই ধ্বংস করছে তাদের ক্ষমা করা মহাপাপ।

শিক্ষাঙ্গনে দলদাস ছাত্র নামধারী সমাজবিরোধীদের হুংকার, অনলাইন পরীক্ষার নামে গণটোকাটুকির সুযোগ চালু রাখা, রাজনৈতিক স্বার্থে পাঠ্যক্রম তৈরি, শিক্ষকতার নামে শুধুই রাজনীতি আর শিক্ষাঙ্গনের উন্নয়নের নামে ঠিকাদারদের থেকে কাটমানি সংগ্রহ--- এইসব ব্যাধি রাজ্যের শিক্ষা-ব্যবস্থাকেই ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এর থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় রাজনীতিকে দূরে সরিয়ে রেখে তীব্র গণ-আন্দোলন সংগঠিত করা। □

আলমগিরনামা বলছে বিশ্বনাথ মন্দির ভেঙেছিলেন আওরঙ্গজেব

বিনয়ভূষণ দাশ

কিছুদিন থেকে সমগ্র ভারতে সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছে কাশীর জ্ঞানবাপী মসজিদ বিতর্ক। অথচ, সঠিক অর্থে বলতে গেলে ঘটনার সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে বিতর্কের কোনো অবকাশই নেই। ঘটনার পেছনে রয়েছেন বারাণসীর সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) আদালতে পাঁচজন মহিলা আবেদনকারী সীতা সাহু, মঞ্জু ব্যাস, রেখা পাঠক, লক্ষ্মীদেবী এবং মূল আবেদনকারী রাখী সিংহ। এই পাঁচজন আবেদনকারী তাঁদের আবেদনে বারাণসীর সিভিল জজ আদালতে আবেদন জানান, কাশী বিশ্বনাথ মন্দির-জ্ঞানবাপী মসজিদ চত্বরের পশ্চিম দেওয়ালের পাশে অবস্থিত তাঁদের আরাধ্যা 'মা শৃঙ্গার গৌরী'র প্রতি শ্রদ্ধাবশত তাঁরা শৃঙ্গার গৌরী স্থানে সারা বছর ধরে পূজা, প্রার্থনা করতে চান ও সেজন্য তাঁদের অনুমতি দেওয়া হোক। আর এই আবেদনের প্রেক্ষিতেই বারাণসীর সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) এক আদেশ জারি করে বিশ্বনাথ মন্দির সংলগ্ন জ্ঞানবাপী মসজিদ চত্বরে 'ভিডিয়োগ্রাফি' করে 'পর্যবেক্ষণ' করার অনুমতি প্রদান করেন। আদালতের এই রায়ের প্রেক্ষিতে মসজিদ পরিচালন সমিতি আপত্তি জানায়। আঞ্জুমান ইন্তেজামিয়া মসজিদের যুগ্ম সম্পাদক সৈয়দ মহম্মদ ইয়াসিন আদালতের পূর্বোক্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে। যদিও এক রায়ে আদালত পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যেতে নির্দেশ দেয় এবং ওই সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণের রিপোর্ট ১৭ মে-র মধ্যে আদালতে জমা দিতে বলে। কিন্তু পরের দিনই মসজিদ কমিটি আদালতের উপরোক্ত নির্দেশকে 'পক্ষপাতদুষ্ট' বলে অভিহিত করে। এই মামলাটি ২০২১-এর আগস্ট থেকে চলে আসছে। একজন বাদে বাকি চারজন আবেদনকারী প্রতিটি শুনানিতেই উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বারাণসী মহানগর সহ-সভাপতি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, তিনি 'ওই পাঁচ ভদ্রমহিলাকে বারাণসী আদালতে আবেদন করতে অনুপ্রাণিত করেছেন।' এই পাঁচজনের মধ্যে তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মী দেবীও আছেন। আবেদনকারীদের অন্যতম, সীতা সাহু বলেন, 'আমরা চারজন এক সৎসঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং আবেদন করার সিদ্ধান্ত নিই। পরে রাখী সিংহ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমাদের আবেদনের অংশীদার হন।'

জ্ঞানবাপী মসজিদ-কাশী বিশ্বনাথ মন্দির বিষয়টি যেহেতু এখন আদালতের বিচার্য তাই সে বিষয়ে আলোচনা থেকে বিরত থেকে আমরা বরং কাশী বিশ্বনাথ মন্দির-জ্ঞানবাপী মসজিদের ঐতিহাসিক দিকটি নিয়ে আলোচনা করি। এ কথা ইতিহাসের সাধারণ ছাত্র এবং সাধারণভাবে শিক্ষিত মানুষজন জানেন যে, কাশী বিশ্বনাথের এই মন্দিরটি মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব ধ্বংস করে তার ভিতের উপর মসজিদ নির্মাণ করেন। এ তথ্য সমস্ত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদরা স্বীকার করেছেন তাঁদের লেখায়। কিছু সন্দর্ভ এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করা প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। সেই ঐতিহাসিকদের মধ্যে যেমন আওরঙ্গজেবের সভাসদ আছে, তেমনই বিভিন্ন ইংরেজ ঐতিহাসিকও আছেন। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে স্যার যদুনাথ সরকার, ভিএস ভাটনগর, এসএম অ্যাডওয়ার্ডস, এইচএলও গ্যারেট, স্তানলি লেন পুল প্রমুখ ঐতিহাসিক আছেন। একটা কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মধ্যযুগের ইতিহাসের মূল উপাদান আমরা পাই আরব ও মধ্য এশিয়া থেকে আগত বিভিন্ন আফগান, তুর্কি, মঙ্গোল ইত্যাদি হানাদারদের সঙ্গে আগত বিভিন্ন বিবরণ লিখিয়েদের বিবরণ থেকে। ওইসব বিবরণ লিখিয়েরা বেশ সোৎসাহে ও সোল্লাসে তাদের পৃষ্ঠপোষক দখলদারদের অপকর্মের বিবরণ দিয়েছেন। তাতে যে ভবিষ্যতে ইরফান হাবিব, মহম্মদ হাবিব, সামসুল আলম, রোমিলা থাপার, সতীশচন্দ্র, সুস্নাত দাশদের মতো আলিগড় পন্থী এবং মার্কসবাদীদের পরবর্তীকালে অসুবিধে হতে পারে তা তাঁরা কল্পনায় আনতে পারেনি।

যাইহোক, আওরঙ্গজেবের এই মন্দির ভাঙা এবং সেই স্থানে মসজিদ গড়ে তোলার সবচেয়ে বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ লিখে গিয়েছেন তাঁরই সভাসদ মহম্মদ কাজিম এবং সাকি মুস্তাইদ খাঁ। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের প্রথম দশ বছরের প্রাত্যহিক বিবরণ আছে মহম্মদ কাজিমের 'আলমগীরনামা'য়। এটি আওরঙ্গজেবের নির্দেশে লেখা হয়েছিল। কিন্তু পরে মুঘল সাম্রাজ্যের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে আওরঙ্গজেব এই লেখা বন্ধ করে দেয়। ১৭০৭ সালে আওরঙ্গজেব মারা যায়। আর মহম্মদ কাজিমও এর মধ্যে মারা যাওয়াতে এই লেখা বন্ধ থাকে। পরবর্তী বছরগুলির প্রাত্যহিক বিবরণ রাজ দরবারের বিভিন্ন দলিল-দস্তাবেজ (আখবরাত) থেকে সংকলন করে লিপিবদ্ধ করেন সাকি মুস্তাইদ খাঁ। আওরঙ্গজেবের দরবারে তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠ সহকারী এবং রাজ্যপরিচালনা ও ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে তাঁর একান্ত অনুরক্ত অনুগামী এনায়েতুল্লা খাঁ আউরঙ্গজেবের দরবারের নমাজঘরের রক্ষক এবং পরবর্তীকালে অর্থ দপ্তরের আমীর সাকি মুস্তাইদ খাঁকে সম্রাটের এক অনুকরণযোগ্য ইতিহাস লিখতে অনুরোধ করেন। এজন্য তাঁকে মুঘল দরবারের সেরেস্তার নথিপত্র (আখবরাত) দেখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তিনি সেখান থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে আলামগীরনামা বইটি সম্পূর্ণ করেন এবং সমগ্র

বইটির নাম দেন, 'মাসির-ই-আলমগিরি'। ঐতিহাসিকদের মতে, এই বইটিই আওরঙ্গজেবের রাজত্বকাল সম্পর্কে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও তথ্যসমৃদ্ধ পুস্তক। নির্ভরযোগ্য এই পুস্তকে বলা হয়েছে, সম্রাটের রাজত্বের দ্বাদশ বছরে, 'বৃহস্পতিবার, ৯ এপ্রিল ১৬৬৯, গ্রহণের দিন ছিল। সম্রাট প্রথা অনুযায়ী নমাজ পাঠ এবং দান খয়রাতি করেছিলেন। তারপর ইসলামে বিশ্বাসী গোঁড়া সম্রাট জানতে পারেন, তাঁর সাম্রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত থাকা, মুলতান এবং বিশেষ করে বারণসীতে বিধর্মী, অবিশ্বাসী ব্রাহ্মণেরা তাঁদের পাঠশালায় ভুল শিক্ষা দেয় এবং বহুদূর থেকে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ ভুল শিক্ষা নিতে এই ব্রাহ্মণদের কাছে আসে। ইসলামের প্রসারে আগ্রহী ক্রুদ্ধ সম্রাট সাম্রাজ্যের অধীনস্থ সমস্ত প্রদেশের শাসকদের কাছে এক সাধারণ নির্দেশ পাঠিয়ে এই সমস্ত ভুল শিক্ষা দেবার পাঠশালা এবং মন্দির অবিলম্বে ভেঙে গুড়িয়ে দিতে নির্দেশ দেন। ঐতিহাসিক S.M. Edwards and H.L.O. Garrett তাঁদের MUGHAL RULE IN INDIA গ্রন্থে লিখেছেন, 'The Muslim governors executed the order with a hearty will. In August, the great temple of Vishwanath at Benaras was pulled down in 1669. আর 'মাসির-ই-আলমগিরি'তে সাকি মুস্তাইদ খাঁ লিখলেন, '2 September—News came to Court that according to the Emperor's command, his officers had demolished the temple of Vishwanath at Benares. ''এমনকী বারাণসী শহরের নামও পরিবর্তন করে রাখা হয়েছিল 'মুহম্মদাবাদ'। সমসাময়িক পর্যটক নিক্কোলো মানুচ্চি তাঁর লেখা Storia of Mogor নামক ভ্রমণ কাহিনিতে লিখেছেন, He (Aurangzeb) also ordered every viceroy and governor to destroy all the temples within his Jurisdiction. সমকালীন অন্যান্য পুস্তকেও আওরঙ্গজেবের এই মন্দির ধ্বংসলীলার বর্ণনা পাওয়া যায়। সমকালীন লেখক ঈশ্বরদাস নাগর তাঁর 'ফুতুহাৎ-ই-আলমগিরী'তেও সাম্রাজ্যজুড়ে এই মন্দির ভাঙার ফতোয়া জারির উল্লেখ করেছেন।

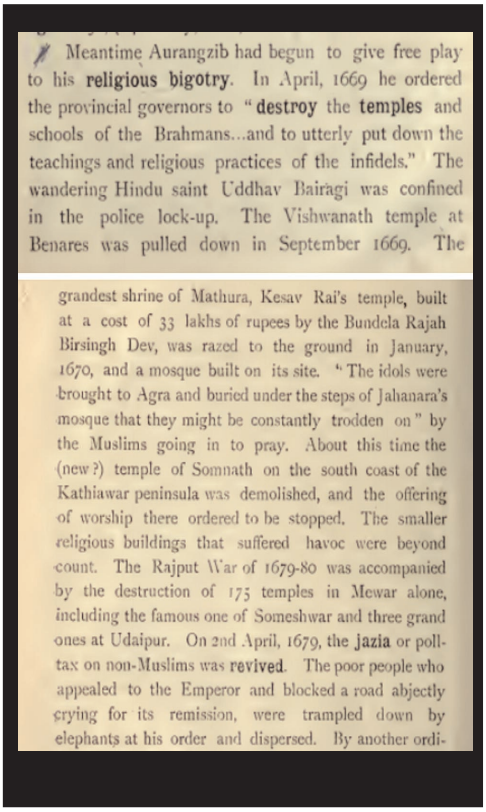

Meantime Aurangzib had begun to give free play to his **religious bigotry**. In April, 1669 he ordered the provincial governors to "**destroy** the **temples** and schools of the Brahmans...and to utterly put down the teachings and religious practices of the infidels." The wandering Hindu saint Uddhav Bairagi was confined in the police lock-up. The Vishwanath temple at Benares was pulled down in September 1669. The grandest shrine of Mathura, Kesav Rai's temple, built at a cost of 33 lakhs of rupees by the Bundela Rajah Birsingh Dev, was razed to the ground in January, 1670, and a mosque built on its site. "The idols were brought to Agra and buried under the steps of Jahanara's mosque that they might be constantly trodden on" by the Muslims going in to pray. About this time the (new?) temple of Somnath on the south coast of the Kathiawar peninsula was demolished, and the offering of worship there ordered to be stopped. The smaller religious buildings that suffered havoc were beyond count. The Rajput War of 1679-80 was accompanied by the destruction of 175 temples in Mewar alone, including the famous one of Someshwar and three grand ones at Udaipur. On 2nd April, 1679, the **jazia** or poll-tax on non-Muslims was **revived**. The poor people who appealed to the Emperor and blocked a road abjectly crying for its remission, were trampled down by elephants at his order and dispersed. By another ordi-

ঈশ্বরদাস নাগর তাঁর গ্রন্থে আরও লিখেছেন, আওরঙ্গজেবকে মথুরার মন্দির ভাঙার খবর জানালে সে আবারও হুকুম জারি করে, সমস্ত মন্দির ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে এবং সেখানে মসজিদ নির্মাণ করতে হবে। এখানে 'সমস্ত' কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হুগলি বন্দরের ইংরেজ কর্মচারী ডি গ্রাফ ১৬৭০ খ্রিস্টাব্দে এক বিবৃতিতে লিখেছেন, 'In month of January, all the Moorish Governors and Officers received orders from the Grand Mughal to prevent the observance of the heathen religion in the whole country and to wall in all the temples and pagodas of the idolators. এখানে 'সমগ্র দেশ' কথাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শুধু বারাণসী বা মথুরার মন্দির নয়, সমগ্র দেশের মন্দির ভাঙার কথা বলা হয়েছে। আওরঙ্গজেবের মন্দির ভাঙার এই ধরনের ফরমান জারির উদাহরণ ওই সময়ের বিভিন্ন পুস্তকে পাওয়া যায়। সেসব ফরমানের ভাষাও অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালেই লেখা হয়েছিল 'মুরাকত-ই-হাসান' (১৬৭০ খ্রিস্টাব্দ)। ওই পুস্তকে বলা হয়েছে, শুধু মন্দির ভাঙার নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হতেন না আউরঙ্গজেব, সঙ্গে Reports of the destruction of temples should be sent to the Court under the seal of the Qazis and attested by pious Shaikhs. এমনকী স্যার যদুনাথ সরকার জানিয়েছেন, ১৬৭২ খ্রিস্টাব্দে বাদশাহ আওরঙ্গজেব তাঁর কর্মচারীদের মাধ্যমে নির্দেশ পাঠিয়ে দেন বাঙ্গলার সমস্ত পরগনায় যত মন্দির আছে সেসমস্ত মন্দির ধ্বংস করার জন্য। এই ধরনের একটি নির্দেশনামা ঢাকা জেলার ধামরাইতে অবস্থিত যশোমাধব মন্দিরে রক্ষিত আছে) (History of Aurangzib Vol. 3---Jadunath Sarkar)।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আউরঙ্গজেবের সময়কালে লেখা বিভিন্ন দলিল দস্তাবেজ, তাঁর নির্দেশে লেখা পুস্তক ইত্যাদি থেকেই পরিষ্কার যে, তাঁর নির্দেশে অন্যান্য মন্দির ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির ভাঙা হয়েছিল এবং তারই কিছু অংশের ভিত্তিভূমির উপর জ্ঞানবাপী মসজিদ গড়ে তোলা হয়েছিল। ভিত্তিভূমি অবিকল রাখা হয়েছিল এবং মন্দিরের একটি প্রাচীর অবিকৃত রাখা হয়েছিল। হয়তো এটা করা হয়েছিল হিন্দুদের মনে আঘাত দেওয়া এবং এটা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য যে, মুসলমান শাসনে কোনো মন্দির গড়া হলে সে মন্দিরের অবস্থা এমনই হবে।

স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর প্ররোচনায় মার্কসবাদী ও আলিগড় পন্থী ঐতিহাসিকরা যে ইতিহাস লিখেছেন সেখানে আউরঙ্গজেবের এবং অন্যান্য মুসলমান শাসকদের হিন্দুমন্দির ভাঙা এবং তার জায়গায় মসজিদ নির্মাণকে সম্পূর্ণ অন্যভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে। কাশী বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংসেরও সেই অপব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ওই মার্কসবাদীদের ব্যাখ্যা হলো, রাজনৈতিক কারণেই ধ্বংস করা হয়েছিল বারাণসীর বিশ্বনাথ মন্দির। তাঁদের মতে, বারাণসীর জমিদার ও হিন্দুরা আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝেই বিদ্রোহ ঘোষণা করত। তাছাড়া বারাণসীর ব্রাহ্মণেরা নাকি মুসলমানদের শিক্ষাদীক্ষায় হস্তক্ষেপ করত। সেইজন্য বিশ্বনাথ মন্দির ভেঙে হিন্দু জমিদার ও হিন্দুসমাজের অন্যান্য নেতৃবর্গকে সাবধান করার চেষ্টা হয়েছিল। এই যুক্তি যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত সেটা বোঝা যায় যখন আমরা দেখি ৯ এপ্রিল ১৬৬৯-এ জারি করা ওই নির্দেশে এবং পরের অন্যান্য নির্দেশে শুধু বারাণসীর মন্দির নয়, সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সমস্ত মন্দির ধ্বংস করে সেখানে মসজিদ গড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ঐতিহাসিক সিন্থিয়া ট্যালবট, রিচার্ড এম ইটন, সতীশচন্দ্র, অড্রে ত্রাসকে ইত্যাদি ঐতিহাসিকেরা এই ধরনের মিথ্যা যুক্তি দিয়ে সকলকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে। □

জ্ঞানবাপীর কুয়োয় স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ

দুর্গাপদ ঘোষ

কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়ে, এটা একটা প্রচলিত আপ্তবাক্য। কিন্তু এর একটা উলটো দিকও যে আছে ক্ষেত্রবিশেষে তাও প্রকাশ পায়। সেটা হলো কেঁচোর অবস্থিতি অস্বীকার করতে গিয়ে চারদিক থেকে কিলবিল করে সাপ বেরিয়ে পড়া। কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের একেবারে গা ঘেঁষা জ্ঞানবাপী মসজিদের ক্ষেত্রে উল্লেখিত আপ্তবাক্যের সেই উলটপুরাণ বেরিয়ে পড়েছে। ক্যামেরা আবিষ্কারের আগেও ক্যামেরা ছিল কিনা এ প্রশ্নের সহজ ও সাধারণ উত্তর অবশ্যই 'না'। কিন্তু গভীর এবং তাৎপর্যপূর্ণ উত্তর খুঁজতে গেলে যা দেখা যাবে তাহলো 'হ্যাঁ'। সে ক্যামেরা হলো ওপরওয়ালার ক্যামেরা। যাতে যে কোনো সময়ের যে কোনো ব্যক্তির যে কোনো অপকীর্তির ছবি বন্দি হয়ে থাকে। যা হলো পাথুরে প্রমাণ, স্থায়ী প্রমাণ। লিখিত ইতিহাসকে গাজোয়ারি করে অস্বীকার করার চেষ্টা করা গেলেও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনকে অস্বীকার করা যায় না। যেমন বহু চেষ্টা করেও কোথাও অস্বীকার করা যায়নি অযোধ্যায় রামজন্মভূমিতে বাবরি মসজিদের বেলায়। এবার ঠিক সেরকমই আর একটা পাথুরে প্রমাণ বেরিয়ে এসেছে জ্ঞানবাপী মসজিদের পরতে পরতে।

জ্ঞানবাপীর ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে কেঁচো ঠেকাতে গিয়ে সাপ বেরিয়ে এসেছে। এবং সেটা প্রায় একরকম আক্ষরিক অর্থেও। ১৬৬৯ সালের ২ সেপ্টেম্বর আদি বিশ্বেশ্বর বা আদি বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংস করে সেইসব ভগ্ন সামগ্রী দিয়ে মন্দিরেরই একাংশে হিন্দু বিদ্বেষী হিসেবে কুখ্যাত মুঘল বাদশাহ আওরঙ্গজেব একটা যে মসজিদ বানিয়েছিলেন এটা ইতিহাসবিদিত। কিন্তু সেই জ্ঞানবাপী মসজিদের মধ্যে কী কী হিন্দু নিদর্শন থেকে গেছে তার বিস্তৃত তথ্য প্রামাণ্য হিসেবে এতদিন সবার সামনে আসেনি। এখন দেখা যাচ্ছে মসজিদের পশ্চিম দিকে সীমানা ঘেরা দেওয়ালের ভেতরের দিকে এক স্থানে রয়েছে স্পষ্টভাবে খোদিত পার্বতী দেবীর মূর্তি যাকে শৃঙ্গার গৌরী বলা হয়ে থাকে। অনেক দিন আগে থেকে হিন্দুরা সেখানে গিয়ে তাঁর পূজার্চনা করে চলে আসতেন। কিন্তু ওই মসজিদের তত্ত্বাবধানকারী স্থানীয় অঞ্জুমান ইন্তিজামিয়া মসজিদ কর্তৃপক্ষ ১৯৯২ সালে তা বন্ধ করার জন্য আদালতে গেলে বারাণসীর এক আদালত তাঁদের আবেদনে সাড়া দিয়ে বছরে কেবলমাত্র একদিনের জন্য চৈত্র নবরাত্রির চতুর্থীতে পূজার্চনার অনুমতি দিয়ে বাকি ৩৬৪ দিনের জন্য তা বন্ধ করে দেন। হিন্দুরা নিরন্তর এ নিয়ে অসন্তোষ এবং ক্ষোভ প্রকাশ করে যাচ্ছিলেন। প্রায় তিন দশক পরে ২০২১ সালের ১৮ এপ্রিল দিল্লির রাখি সিংহ এবং বারাণসীর লক্ষ্মী দেবী, সীতা সাহু, রেখা পাঠক এবং মঞ্জু ব্যাস (জ্ঞানবাপী মসজিদের বিরুদ্ধে এই ব্যাস পরিবারের তরফে আইনি লড়াইয়ের একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে)

জ্ঞানবাপীর ভেতরে পাওয়া শিবলিঙ্গ।

বারাণসীতে সিভিল জজের দরবারে একটা আবেদন দাখিল করেন। তাতে শৃঙ্গার গৌরী ছাড়াও মন্দির-মসজিদের চত্বরে বিরাজমান শিবের বাহন নন্দী, গণেশ এবং হনুমানের বিগ্রহকে নিত্য পূজার্চনার অধিকার চাওয়া হয়। সেই সঙ্গে বিপক্ষের তরফে কোনোরকম বাধাদান যাতে না আসে এবং মূর্তিগুলোর যাতে কোনো ক্ষতি সাধন না করা হয় তার দাবি করেন আবেদনকারীরা। কিন্তু মসজিদ কর্তৃপক্ষের তরফে মসজিদের মধ্যে শৃঙ্গার গৌরীর অবস্থানকে আড়াল করার জন্য বাদীপক্ষের আবেদনের ঘোরতর আপত্তি করেন। কারণ ইসলামি তত্ত্ব মোতাবেক কোনো মসজিদের মধ্যে অন্য ধর্মাবলম্বীদের মূর্তি কিংবা অন্য কোনো চিহ্ন থাকলে সেটা মসজিদ হিসেবে গণ্য করা হয় না এবং সেখানে নমাজ পাঠ করা যায় না। জ্ঞানবাপী মসজিদের ক্ষেত্রে এই শৃঙ্গার গৌরীর পুজো ঠেকাতে গিয়ে মামলার জল অনেক দূর পর্যন্ত গড়িয়েছে।

এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে মসজিদের মধ্যে কী কী হিন্দু চিহ্ন রয়েছে, শিবলিঙ্গ রয়েছে কিনা ইত্যাদি অনুসন্ধানের জন্য সিভিল আদালত দু' পক্ষের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এবং আদালতের তরফে নিযুক্ত কোর্ট কমিশনারের তত্ত্বাবধানে একেবারে ক্যামেরা, ভিডিয়ো ক্যামেরায় ফোটোগ্রাফির সাক্ষ্য-প্রমাণ-সহ সার্ভে করার নির্দেশ জারি করেন। অঞ্জুমান ইন্তিজামিয়া মসজিদের পক্ষ থেকে ঘোরতর আপত্তি এবং আদালতে গিয়ে সার্ভের বিরুদ্ধে বাধা দেওয়ার প্রবল চেষ্টার পরেও কোনো লাভ হয়নি। শেষ পর্যন্ত গত ৬-৭ এবং ১৪, ১৫ ও ১৬ মে সেই সার্ভে করার সময় একের পর এক 'সাপ'-এর প্রমাণ সামনে চলে এসেছে। সে 'সাপ' কেবল বাঙ্গলায় প্রচলিত আপ্তবাক্যের সাপ নয়, আক্ষরিক অর্থে সাপের চিহ্ন মিলেছে। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে যাকে বলে 'শেষনাগ'। মসজিদের পশ্চিম দিকের প্রবেশ দ্বারের মাথার

ওপরই খোদিত রয়েছে কলসের ওপর কলস চিহ্ন। দেখা গেছে দু'দিক থেকে ওপরের দিকে উঠে যাওয়া সেইসব কলসাকৃতি যাদের নীচে চক্রের অথবা সূর্যের মতে চিহ্ন রয়েছে তাদের মাথার ওপর আরও ওপর থেকে নেমে এসেছে পূজার্চনা, মঙ্গলারতির ঘণ্টা।

বারাণসী সিভিল জজ (সিনিয়র) রবিকুমার দিবাকরের এজলাশে গত ১৯ মে সকাল বেলাতেই কোর্ট কমিশনার অজয় কুমার মিশ্র এবং পরে অন্য দুজন কোর্ট কমিশনার যে সার্ভে রিপোর্ট জমা দিয়েছেন তাতে সব মিলিয়ে কোন কোন চিহ্নের কথা তুলে ধরা হয়েছে তার সবকিছু এখনো প্রকাশ্যে আসেনি। কিন্তু যেটুকু প্রকাশ পেয়েছে তার মধ্যে বড়ো মাপের 'শিবলিঙ্গ'ও আছে। অবশ্য তার আগেই হিন্দু পক্ষের একজন আবেদনকারী অধ্যাপক সোহনলাল আর্য ১৬ মে সার্ভের পর বাইরে বেরিয়ে এসেই হাতের দুই আঙুলে ইংরেজি অক্ষর 'ভি' অথাৎ ভিক্টরি চিহ্ন দেখিয়ে জানান, 'নন্দী কো উসকে বাবা মিল গয়ে'— 'নন্দী তার বাবাকে পেয়ে গেছে। বাবার জন্য তার দীর্ঘ সাড়ে তিন শো বছরের প্রতীক্ষার অবসান ঘটেছে।' সেদিন শ্রী আর্যর কথাগুলো দারুণ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবর অনুসারে, প্রথমে নিযুক্ত কোর্ট কমিশনার শ্রী মিশ্র ছাড়াও পরে নিযুক্ত বিশেষ কোর্ট কমিশনার বিশাল সিংহ ১৯ মে দুপুরের পর ১৫ পাতার সার্ভে রিপোর্টের সঙ্গে তিনটে সিল করা বাক্সে স্টিল ফটো, ভিডিয়ো ক্লিপিংস ছাড়াও পুরো কাশী বিশ্বনাথ মন্দির-জ্ঞানবাপী মসজিদের একটা পুরনো মানচিত্র (নকশা) যাকে 'গ্রাউন্ড প্ল্যান' বলা হচ্ছে তা জমা দিয়েছেন। সেসব কোর্টের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত। সুত্র মোতাবেক কোর্টের কাছে যে সমস্ত ফটো ইত্যাদি জমা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে ১,৫০০ স্টিল ফোটো এবং সব মিলিয়ে মোট প্রায় ১০ ঘণ্টার ভিডিয়ো রেকর্ড রয়েছে। আরও জানা গেছে যে উল্লেখিত মানচিত্র গম্বুজের মধ্যে জিগ-জ্যাগ কাটা নকশা এবং মূল মণ্ডপের যে সমস্ত চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেছে তার সঙ্গে কিছু ঐতিহাসিক গ্রন্থ যেমন অধ্যাপক আলতেকরের লেখা 'হিস্ট্রি অব বেনারাস' এবং জেমস প্রিন্সেপ-এর লেখা 'ভিউ অব বেনারস' গ্রন্থে যে সমস্ত মানচিত্র এবং ছবি মুদ্রিত হয়েছে তার সঙ্গে প্রায় হুবহু মিল দেখা যাচ্ছে। রিপোর্টে পরিষ্কার ভাবেই জানানো হয়েছে যে জ্ঞানবাপী মসজিদের মধ্যেকার দেওয়ালে দেওয়ালে খোদিত ও মুদ্রিত রয়েছে স্বস্তিক চিহ্ন, ত্রিশূল, শেষনাগ, ঘণ্টা, পানপাতা, পদ্মফুল, গণেশ মূর্তি, হনুমানের মূর্তি ও তিনটি ডমরু। এছাড়া স্থানে স্থানে মিলেছে দেবদেবীর আসন এবং দেওয়ালের গায়ে খোদাই করা বেশ কিছু কুলুঙ্গি। এরকম একটা কুলুঙ্গির মধ্যে এখানো একটা প্রদীপের মতো আধারের মধ্যে ছোটো একটা শিবলিঙ্গও রয়েছে বলে দাবি করেছেন হিন্দু পক্ষের একজন আবেদনকারী মহান যাদব যিনি সার্ভে দলের সঙ্গে থেকে ঘুরে ঘুরে নিজের চোখে সবকিছু দেখেছেন। বিশেষ করে মসজিদের পশ্চিম দিকের দেওয়ালের ভেতরের দিকে এক নজর বোলালে যে কেউ-ই চোখ বুজে বলে দেবেন এটা অবধারিতভাবে কোনো হিন্দু মন্দিরের দেওয়াল বা মন্দিরেরই কোনো অংশ।

অধ্যাপক সোহনলাল আর্যর কথামতো মসজিদের মধ্যে জায়গায় জায়গায় সিন্দুরের প্রলেপও রয়েছে। বিশেষ করে শৃঙ্গার গৌরী, হনুমান এবং গণেশ মূর্তির আশেপাশে। তাঁর অভিযোগ, সার্ভের আগে অনেক হিন্দু চিহ্নের নকশাকে আড়াল করার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে, সেসবের ওপরে হোয়াইটওয়াশ করা হয়েছে। কিন্তু তাতে চিহ্নের আকৃতিগুলিকে পুরোপুরি আড়াল করা যায়নি। তিনি এমনও জানিয়েছেন যে, মসজিদের মূল কেন্দ্রে স্বয়ং ইমামের বসার আসনের তলাতেও হিন্দু চিহ্নের অবয়ব দেখতে পেয়েছেন তাঁরা।

তবে সবচাইতে বড়ো প্রমাণ মিলেছে মসজিদের মধ্যে ওজুখানা বা নমাজের আগে হাত-পা ধোয়ার জলাশয়ের ঠিক মাঝখানে। সেখানে একটা কুয়োর মধ্যে বিরাজ করছেন 'স্বয়ম্ভু আদি বিশ্বেশ্বর শিবলিঙ্গ।' স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা গেছে যে সেই লিঙ্গাকৃতির চারদিকে গোলাকার একটা বেষ্টনী রয়েছে যা এক নজরেই একটা কুয়া বলে প্রতীত হয়। মন্দির ধ্বংসের সময় আদি শিবলিঙ্গকে যে একটা কুয়ার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছিল একথা অনেকেরই জানা। প্রথমত, জ্ঞানবাপীর অর্থ হলো জ্ঞানের কুয়া। এই লিঙ্গ নিয়ে বিস্তর বিতর্ক বেধেছে। কারণ অঞ্জুমান ইন্তিজামিয়ার পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে যে ওটা আসলে একটা পুরনো এবং বর্তমানে বিকল হয়ে থাকা ফোয়ারা। কিন্তু তার প্রায় সবকিছু নিয়েই অনেক কিছু প্রশ্ন উঠে এসেছে। মুসলমান পক্ষের চোখের সামনেই যখন তার অবস্থান পরিষ্কার হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হিন্দু পক্ষের সবাই তার আকার অবয়ব দেখেই পরম শ্রদ্ধা ও আবেগে 'হর হর মহাদেব ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠেন'। কিন্তু মুসলমান পক্ষ যখন তাকে ফোয়ারা বলে চিহ্নিত করার মরিয়া চেষ্টায় নামেন তখন হিন্দু পক্ষের প্রতিনিধিরা তাঁদের ফোয়ারাটা চালিয়ে দেখাতে বললে তাঁদের কেউ কেউ বলেন এটা ১২ বছর ধরে অকেজো হয়ে আছে, কেউ কেউ বলেন ২০ বছর ধরে। হিন্দু পক্ষ যখন বলেন যে ফোয়ারা হলে নিশ্চয় এর তলায় জল জোগানোর পাইপ লাইন থাকবে, জল যাতে ওপরে উঠে ছিটকে পড়তে পারে তার জন্য হাওয়ার চাপ দেওয়ার কম্প্রেসার থেকে থাকবে কিংবা অনেক উঁচু থেকে জল নীচে নেমে চাপ সৃষ্টি করার জন্য ওপরে কোথাও কোনো ট্যাঙ্ক জাতীয় কিছু থাকবে। আপনারা সেসবের কোথায় কী আছে আমাদের দেখান। তখন মসজিদ কর্তৃপক্ষ তার কোনোকিছুই দেখাতে পারেননি। হিন্দু ওই লিঙ্গাকৃতির তলায় খুঁড়ে পাইপ লাইন আছে কিনা দেখতে গেলে তাতেও প্রবল বাধা দেওয়া হয়।

বস্তুত ২৫ ফুট লম্বা ও ২৫ ফুট চওড়া বর্গাকার ওই জলাশয়ের জল সরিয়ে সেখানে কী আছে না আছে তার খোঁজ করতে গেলে মুসলমান পক্ষের তরফে প্রথমদিকে তা দেখার জন্য জল সরাতে দিতেই আপত্তি করা হয়। কিন্তু ১৬ মে শেষ পর্যন্ত তাঁদের আপত্তি নস্যাৎ করে কোর্ট কমিশনাররা সাফাই কর্মী এবং উত্তরপ্রদেশ সরকারের মৎস্য বিভাগের লোকেদের ডেকে সাকশন পাইপ এবং বালতি করে জল সরনোর ব্যবস্থা করেন। এইভাবে বেশ কিছুটা জল সরতেই নজরে পড়ে জলাশয়ের মাঝখানে রয়েছে কুয়োর

জ্ঞানবাপীর পশ্চিমদিকের দেওয়ালে শৃঙ্গার গৌরী।

মতো গোলাকৃতির কাঠামো। আরও জল সরাতে ক্রমে দেখা যায় তার মাঝখানে শিবলিঙ্গের মতো এবং বেশ মোটা কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। যার গায়ে রয়েছে সবুজ রঙের শ্যাওলার (মস) পরত। কোনো কিছু দীর্ঘদিন জলের মধ্যে ডুবে থাকলে যেটা স্বাভাবিক ভাবেই হয়ে থাকে। হিন্দু পক্ষ তখন একটা শক্ত কিছু দিয়ে লিঙ্গাকৃতির গায়ে জমে থাকা শ্যাওলার পরত সরাতেই দেখা যায় আদতে তাহলো মিশকালো (জেডব্ল্যাক) এবং মসৃণ পাথরের স্তম্ভের মতো। সোহনলালের দাবি, 'ওই মসৃণ ও বেশ উজ্জ্বল পাথরটি হলো অতি মূল্যবান কষ্টিপাথর বা জেডস্টোনে 'নির্মিত শিবলিঙ্গ। তবে তার মাথার দিকটা সাধারণ ভাবে সবার দেখা শিবলিঙ্গের মতো গোলানো নয়।' সেখানে সাদাটে রঙের একটা চাকতির মতো কিছু রয়েছে। গোলানো লিঙ্গাকৃতির স্তম্ভের সঙ্গে তা জুড়ে দেওয়া হয়েছে হোয়াইট সিমেন্ট বা আঠালো পুটিং জাতীয় কোনোকিছু দিয়ে। আর একেবারে মাথার ওপরের চাকতিতে রয়েছে ৫টা খাঁজকাটা দাগ এবং ঠিক মাঝখানে একটা ছিদ্র। মুসলমান পক্ষ যখন দাবি করতে থাকেন যে ওই ছিদ্র দিয়ে ফোয়ারার জল বেরোত তখন অনুসন্ধানকারীরা একটা লোহার লম্বা শিক ঢুকিয়ে সত্যিই নীচে পর্যন্ত ছিদ্র আছে কিনা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেন ৬৩ সেন্টিমিটার মতো গিয়ে শিকটা সেখানেই আটকে যাচ্ছে। তার বেশি আর যাচ্ছে না। উল্লেখ করা যেতে পারে যে কোর্টকে জমা দেওয়া রিপোর্টে এসব তথ্য জানানো হয়েছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পারা গেছে। সূত্র অনুসারে রিপোর্টে জানানো হয়েছে যে গোলাকার ওই পাথর যা শিবলিঙ্গের মতো দেখতে আপাতত তার উচ্চতা হলো ২ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং বেড়-এর বা বৃত্তের ব্যাসার্ধ (রেডিয়াস) হলো ৪ ফুট। তার মানে 'লিঙ্গ'টির ব্যাস হলো ৯ ফুট। অর্থাৎ তার বেড় প্রায় ২৪-২৫ ফুট বা সেটা ২৪-২৫ ফুট মোটা। তার মাথার ওপরে সাদা রঙের যে চাকতির মতো জিনিস রয়েছে তার ব্যাসার্ধ ৭ ইঞ্চি। মানে ১৪ ইঞ্চি ব্যাসের বা ৪২ ইঞ্চি মতো বেড়ের এবং চাকতিটা আধ ইঞ্চি পুরু। দেখলেই বোঝা যায় সেটা মূল স্তম্ভের অংশ নয়, বাইরে থেকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। স্তম্ভের গা থেকে শ্যাওলার পরত সরিয়ে দেওয়ার পর সেটাকে যে শিবলিঙ্গের মতোই মনে হচ্ছে একথা জমা দেওয়া রিপোর্টে স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, কোর্টের কাছে সার্ভে রিপোর্ট জমা দেবার আগে ১৬ মে সকালে সার্ভে কাজ শেষ হবার আগেই মাঝপথে হিন্দু পক্ষের একজন উকিল হরিশঙ্কর জৈন একবার তড়িঘড়ি বেরিয়ে যান এবং সটান সিভিল জজ রবিকুমার দিবাকরের কাছে গিয়ে ওজুখানার মাঝখানে পাওয়া 'শিবলিঙ্গ'-এর নিরাপত্তা রক্ষার আর্জি পেশ করে আসেন। সিভিল কোর্টও কালবিলম্ব না করে বারাণসী প্রশাসন, পুলিশকর্তা এবং সিআরপিএফ কর্তাদের গোটা ওজুখানা সিল করে নিরাপত্তা বিধানের নির্দেশ দেন। সেইমতো সেদিনই ওজুখানার চারপাশে উঁচু গ্রিলের চারিদিকে সিআরপিএফ জওয়ানদের মোতায়েন করা হয়েছে। ওজুখানায় প্রবেশের তিনটে দরজাতেই তালা লাগিয়ে সিল করে কোর্টের কাছে সমস্ত চাবি জমা রাখা হয়েছে। ১৯ মে সুপ্রিম কোর্টও তা মঞ্জুর করেছেন এবং 'শিবলিঙ্গ'-র নিরাপত্তা রক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন। কঠোর নিরাপত্তা বলয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে শিবলিঙ্গ-সহ গোটা ওজুখানা। কাউকে তার ধারেকাছে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। শৃঙ্গার গৌরীর পূজার্চনায় বাধা না দিলে হয়তো এখনই এত সমস্ত নিদর্শনের কথা প্রকাশ নাও পেতে পারত।

প্রবাসী বাংলাদেশির চোখে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ

শিতাংশু গুহ

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কি? যে কোনো দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে মুখ্যত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের ওপর। একটি ব্যতীত অপরটি গুরুত্বহীন। উন্নত দেশগুলোর অর্থনীতি মজবুত, রাজনীতি পরিশীলিত, সামাজিক প্রেক্ষাপট সচেতন ও উন্নত। একটি দেশ ধনী হতে পারে কিন্তু রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে সেটি পশ্চাৎপদ, গুরুত্বহীন বা মানব-কল্যাণকর নাও হতে পারে। যেমন কুয়েত, আরব-আমিরাত বা সৌদি আরব, এমনকী প্রায় পুরো আরব বিশ্ব। এ কারণে একজন বাংলাদেশিকে যে কোনো আরব দেশ অথবা ইউরোপ-আমেরিকায় স্থায়ীভাবে থাকার সুযোগ দিলে তিনি আরব দেশে যাবেন না, আমেরিকায় যাবেন। কারণ সেখানে 'কোয়ালিটি অব লাইফ' উন্নত, রাষ্ট্র কল্যাণমুখী এবং বহুলাংশে বৈষম্যহীন। সুতরাং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হতে হলে একই সঙ্গে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন হতে হবে। কিন্তু তা হচ্ছে কি বা আদৌ হবে কি?

বলা হচ্ছে, অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা আগের চেয়ে ভালো। এর মানে এই নয় যে, গরিবের ছেলেটা 'দুধেভাতে' বড়ো হচ্ছে। বাংলাদেশের ক্রেডিট লাইন ভালো, টাকা আসছে। কাঁচা টাকা। ঋণ বাড়ছে। 'পার ক্যাপিটা ইনকামের সঙ্গে ঋণটা' মিলালে বিষয়টা বোঝা যেতে পারে। বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্ভবত ঋণের টাকায় ঘি খাওয়ার মতো। দক্ষিণ এশিয়ায় দ্রুত অগ্রসরমান দেশ শ্রীলঙ্কা দেউলিয়া হবার পথে। দেশটি ঋণখেলাপি। বাংলাদেশের অবস্থা শ্রীলঙ্কার মতো হবে না তো? মন্ত্রীরা বলেছেন, 'বাংলাদেশের অবস্থা শ্রীলঙ্কার মতো হবে না, কারণ দেশটি অর্থনীতির শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত'। এই ভিত্তিটা কী? বাজেট অনুযায়ী বাংলাদেশের আয়ের মুখ্য উৎস হচ্ছে গার্মেন্টস, প্রবাসী রেমিট্যান্স ও ঋণ। আমাদের ভারী শিল্প নেই। রপ্তানি আয় সামান্য। চোর বেড়েছে। ব্যাংক ও রাষ্ট্রীয় খাতে লুটপাট হচ্ছে। সম্পদ

বাইরে চলে যাচ্ছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভিত্তি নড়বড়ে। এসব লক্ষণ ভালো নয়। ভেনেজুয়েলা শুধুমাত্র তেলের ওপর ভিত্তি করে চকচকে অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়েছিল, ধপাস করে পড়ে যেতে বেশি সময় নেয়নি। বলা হয়, একটি দেশের বৈদেশিক ঋণ জিডিপির ৪০ শতাংশের বেশি হলে তা বিপজ্জনক। বাংলদেশের তা ২২ শতাংশ, এটি সুখবর।

অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দরকার। বাংলাদেশে এ মুহূর্তে তা আছে কিন্তু সেটি রাজনৈতিক বন্ধ্যাত্বের বিনিময়ে। দেশে রাজনীতি নেই। নেতা নেই। মোল্লাবাদের রমরমা। বঙ্গবন্ধু সরকারের পর জিয়া, এরশাদ, খালেদা জিয়া সরকারের ক্ষমতার উৎস ছিল সাম্প্রদায়িক শক্তি। ১৯৯৬, ২০০৯-এ আওয়ামি লিগের ক্ষমতার উৎস ছিল জনগণ ও প্রগতিশীল শক্তি। এখন তা নেই। এখন সেটি সাম্প্রদায়িক শক্তি। আওয়ামি লিগ-বিএনপি'র মধ্যে এখন গুণগত কোনো তফাত নেই। সুতরাং মোল্লাবাদ বাড়বে বই কী। রাজনীতি নেই, শূন্যস্থান পূরণ করছে অপশক্তি। গণতন্ত্র নেই। সংসদ অকেজো। মিডিয়া ভীত-সন্ত্রস্থ। বিচার বিভাগ মুখ থুবড়ে পড়েছে। ব্যাংক লুটপাট চলছে। স্টকমার্কেট অনিশ্চিত। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বলতে কিছু নেই। নির্বাচনী ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। দুর্নীতি আকাশ ছোঁয়া। একদা স্লোগান ছিল 'আমরা সব তালেবান, বাংলা হবে আফগান'। বাংলাদেশ সেইদিকে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রশাসন মোটামুটি লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে। বাংলাদেশে এখন প্রশাসন সরকারের কথায় চলে না, সরকার মোল্লাবাদের চাপে চলে।

দেশের সামাজিক কাঠমো ভেঙে পড়েছে। সমাজ পরিবর্তনশীল, সেটি হওয়া চাই ইতিবাচক। বাংলাদেশে হচ্ছে নেতিবাচক। ধর্মান্ধতা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। বাংলাদেশের মানুষ এখন প্রায় সবাই ধর্মের শিক্ষক, সবাই জ্ঞান দিতে চান। এক-দেড় মিনিট বা কখনো-সখনো আরও কম সময় কারো সঙ্গে কথা বললেই ধর্ম এসে যায়! শিক্ষার মান কমতে কমতে কোথায় গিয়ে ঠেকছে কে জানে? এখন ছাত্ররা রেকর্ড করে হিন্দু শিক্ষককে 'ধর্ম অবমাননার' নামে ফাঁসিয়ে দেয়। সরকার, প্রশাসন, স্কুল কর্তৃপক্ষ সবাই ছাত্রকে বাহবা দেয়। পঞ্চম শ্রেণীর ইসলামি শিক্ষা বইয়ে পড়ানো হয়— 'বিধর্মীরা পশুর চেয়ে অধম'। মাদ্রাসায় প্রথম শ্রেণীর 'আদর্শ' গণিত শিক্ষা বইয়ে অঙ্ক হচ্ছে, এক মুজাহিদ জেহাদি ময়দানে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় দিনে যদি যথাক্রমে ১৪, ১৮, ১২ জন কাফের মারেন, তাহলে তিনি মোট কতজন কাফের মারলেন? সুস্থ সমাজের কতগুলো মাপকাঠি থাকে, যেমন সততা, চুরি না করা, মিথ্যা না বলা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, কাউকে ব্যথা না দেওয়া বা অপরের ক্ষতি না করা ইত্যাদি। বাংলাদেশে এখন এসবের বালাই নেই। সমাজে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত নেই। সবাই স্রোতের অনুকূলে গা-ভাসিয়ে দিয়েছেন। প্রতিকূলে উজন বাইবার মানুষ নেই। শেখ হাসিনা নিজেই বলেছেন, তাকে ছাড়া সবাইকে কেনা যায়। সামাজিক মার্কেটে যদি সবাই বিক্রি হন, তাহলে একটি সমাজের চেহারা যা হওয়ার কথা, সমাজটা এখন তা-ই।

দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ আতঙ্কিত। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তা কী? আমাকে একজন সুহৃদ সর্বদা বলেন, ক্ষোভ-দুঃখ যাই থাকুক দেশটি আমাদের, দেশটিকে বাঁচাতে হবে। তা ঠিক, সেই ভাবনা থেকেই প্রশ্ন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কী? □

কাশ্মীরে হিন্দুহত্যা এখনও চলছে

১৯৪৭-এ দেশ ভাগের সময় বালুচিস্তান পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় খান আব্দুল গফ্‌ফর খান তীব্র যন্ত্রণা বিদ্ধ হৃদয়ে অবিস্মরণীয় উক্তি করেছিলেন, 'আমাদের নেকড়ের মুখে ঠেলে দেওয়া হলো'। দেশভাগের ৭৫ বছর অতিক্রান্ত কিন্তু হিংস্র নেকড়েদের ক্রমাগত জেহাদি আক্রমণ আজও অব্যাহত। যারা বলেছিল 'হাসকে লিয়া পাকিস্তান, লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্তান' সেই রক্তপিপাসু হায়নাদের জেহাদি থাবায় আজও সমগ্র ভারতবর্ষ ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত, বিপর্যস্ত। শুরু হয়েছিল কাশ্মীর দিয়ে, পদ্ধতি সেই একই, মহম্মদ বিন কাশিমের সময় (৭১২ খ্রি:) থেকে চলে আসা বহু পরীক্ষিত নৃশংস জেহাদি প্রক্রিয়া। প্রথমে ব্যাপকভাবে হিন্দুহত্যা, ধর্মান্তরকরণ, বিতাড়ন, তারপর জেহাদি বংশ বৃদ্ধির মাধ্যমে এলাকা দখল। স্বাধীনতার সময় থেকেই এই জেহাদি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একের পর এক হিন্দু শূন্য হয়েছে কাশ্মীরের বিস্তীর্ণ এলাকা। 'হিজবুল মুজাহিদিন,' 'লস্কর-ই-তৈবা', 'হরকত উল জেহাদ আল ইসলামি', 'জইস এ মহম্মদ' ইত্যাদি আরও কত 'আল' 'উল' বাহিনী একই উদ্দেশ্য নিয়ে জেহাদি প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে। একটা সময় ব্যাপক ভাবে কাশ্মীরে হিন্দু হত্যা হয়েছে। ধর্ষিতা হয়েছে অসংখ্য হিন্দু নারী, সম্মান রক্ষায় অনেক হিন্দু নারীকে বিষ পান পর্যন্ত করতে হয়েছে। রুবিয়া অপহরণ, চরারে শরিফ, হজরত বাল কাণ্ডগুলির সঙ্গে হিন্দুদের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও আক্রান্ত হয়েছে হাজার হাজার হিন্দু পরিবার। এক কাপড়ে লক্ষ লক্ষ কাশ্মীরি পণ্ডিতকে কাশ্মীর ছেড়ে পালিয়ে আসতে হয়েছে। আজ সমগ্র ভারতবর্ষে অসংখ্য হজ হাউস থাকলেও, অমরনাথ তীর্থ যাত্রীদের তীব্র ঠাণ্ডা থেকে বাঁচাতে কাশ্মীরে কিছু নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হলে, বিরোধিতায় নেমে পড়ে জেহাদি মুসলমান সমাজ। পারস্পরিক বিরোধিতা ভুলে হিন্দু বিরোধিতায় এক হয়ে যায়, জেকেএলএফ, মেহবুবা মুফতি, ফারুক আবদুল্লারা। সেই একই চিত্রনাট্য। উগ্রবাদীদের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় অগণিত নিরীহ অমরনাথ যাত্রীর দেহ। পথ চলতি বাস থামিয়ে অহিন্দু এবং হিন্দু যাত্রীদের আলাদা করা হতো, তারপর হতভাগ্য হিন্দুদের কপালে জুটত একে-৪৭-এর গরম সিসে। ৯০ অথবা তার পরবর্তী দশকে কাশ্মীরে এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটত। পরিবার বাদে এদের জন্যে কাঁদবার কেউ ছিল না। বুদ্ধিজীবীরা মোমবাতি, সাংবাদিকরা কলমের ব্যবহার ভুলে যেতেন। দৈবাৎ কেউ একটু আধটু প্রতিবাদ করলে তাকে তারাই সাম্প্রদায়িক দাগিয়ে দিতেন। পশ্চিমবঙ্গে তো এটা খুবই চলত। আজ যখন কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলুপ্ত, কাশ্মীরে কেন্দ্রীয় শাসন চলছে, তখন আবার বিক্ষিপ্তভাবে হলেও শুরু হয়েছে বেছে বেছে হিন্দু হত্যা। গত কয়েক মাসে এমন বেশ কিছু ঘটনা সামনে এসেছে। কিছুদিন আগেও একটি স্কুলে বেছে বেছে হিন্দু হত্যা করা হয়েছে। গত ১২ মে সন্ধ্যায় খুন করা হলো কাশ্মীরি পণ্ডিত রাহুল ভাটকে। তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের যথারীতি কোনও হেলদোল নেই। প্রতিবাদ নেই কাশ্মীরের বৃহত্তম মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকেও। তাই হিন্দু সমাজকেই প্রতিবাদে এগিয়ে আসতে হবে।

—মন্দার গোস্বামী,
২৩ ঈশ্বরবাবুর গলি, খাগড়া,
বহরমপুর মুর্শিদাবাদ।

কুকুরের লেজ কখনো সোজা হয় না

আমাদের দেশের কংগ্রেস দলের সঙ্গে কুকুরের লেজের তুলনা চলে। যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, কুকুরের লেজ কিছুতেই সোজা হবে না। যতই চেষ্টা করুক, যতই চিন্তন শিবির করুক, কংগ্রেস আছে কংগ্রেসেই। পরিবারতন্ত্র ছেড়ে কিছুতেই দলটিকে বার করে আনা যাবে না। কুকুরের লেজ কখনো সোজা হয় না।

দেশের স্বাধীনতা আজ ৭৫ বছরের হলো। পরিবারতন্ত্র থেকে কংগ্রেস দলের যুব কর্মীরা আর স্বাধীনতা পেল না। পরিবারতন্ত্র যুব কর্মীদের হতাশার কারণ। এ এক প্রকার অভিশাপ। শতবর্ষ অতিক্রান্ত কংগ্রেসের ছোঁয়া লেগে আজ দেশের আঞ্চলিক দলগুলিরও ওই পরিবারতন্ত্রের রোগ লেগেছে। তাকিয়ে দেখুন? মমতা, অখিলেশ, লালু, মায়াবতী ও জগনের দলের দিকে। উত্তর পেয়ে যাবেন। এরা সবাই গণতন্ত্রের পূজারি। কিন্তু এরা কেউই দলের রাশ যোগ্য কোনো ব্যক্তির হাতে দেবে না।

মাঝে মাঝে সোনিয়া-রাহুল-প্রিয়াঙ্কারা দেশপ্রেমিক হয়ে ওঠেন। অবশ্যই তা দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য। এরা কেমন দেশপ্রেমিক জানেন? শুনুন তা হলে। মহারাষ্ট্রের দাভলে ১৯৯২ সালে এনরন কোম্পানি এসেছিল কারখানা করতে। স্থানীয় লোকেদের তীব্র বিরোধিতায় তারা কারখানা চালু করতে পারেনি। তাই তারা আন্তর্জাতিক আদালতে ভারতের বিরুদ্ধে মামলা করে ৩৮০০০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে। সেসময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী। তিনি হরিশ সালভেকে মামলার দায়িত্ব দেন। এই মামলায় এনরন কোম্পানির হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন পি চিদম্বরম। দেশের বিরুদ্ধে মামলা লড়েছেন তিনি। পরে ইউপিএ-১ সরকারের আমলে মন্ত্রী হয়ে আর মামলা লড়েননি। কিন্তু ইউপিএ-১ সরকার হরিশ সালভেকে সরিয়ে ভারতের হয়ে মামলা লড়ার দায়িত্ব দেওয়া হয় খায়ার কুরেশিকে। তিনি একজন পাকিস্তানি আইনজীবী ছিলেন। ওরা দেশের আইনজীবীদের উপর হয়তো ভরসা রাখতে পারেননি। তাই হয়তো পছন্দ পাকিস্তানের আইনজীবী। ওরা তো আগমার্কা দেশপ্রেমিক। কুরেশি সাহেব তার ফি বাবদ ১৪০০ কোটি টাকা নিয়েও মামলাটি জেতাতে পারেননি। এনরন কোম্পানি জয়ী হয়। আমাদের দেশকে ৩৮০০০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। আজ যারা বিজেপি ও নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরোধিতা করে প্রধানমন্ত্রী হতে চাইছে তারাও নিজ স্বার্থে চুপ ছিল। আর

যে সব চাটুকার বুদ্ধিজীবী বর্তমানে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে লিখে চলেছেন তারাও চুপ। আসলে এরা সবাই চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।

—**শ্যামল কুমার হাতি,**
চাঁদমারী রোড, হাওড়া-৯।

লেদার টেকনোলজি কলেজ ট্যানারি চাই

লেদার টেকনোলজি কলেজ একটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অথচ এখানে ট্যানারি ল্যাবরেটরি নেই বহু বছর। হাসপাতাল ছাড়া যেমন ডাক্তারি শিক্ষা হয় না, তেমনি ট্যানারি ছাড়া লেদার টেকনোলজি শিক্ষা সম্পন্ন হয় না। ফলত যে সমস্ত পড়ুয়া প্রতি বছর পাশ করে, শিল্প জগতে গিয়ে তাদের সঠিক মূল্যায়ন হয় না। অনুরূপ বেতন পায় না। আমরা যখন ওই কলেজে পড়াশোনা করতাম তখন পর্যাপ্ত পরিমাণে গোরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি পশুর চামড়া কলেজ কর্তৃপক্ষ কিনত এবং চতুর্থ বছরে আমাদের পর্যাপ্ত ট্যানারি ল্যাবরেটরির কাজ হতো। যার ফলে শিল্প জগতে প্রবেশ করার আগে চামড়া তৈরির ব্যাপারে কিছু ধারণা আমাদের হতো। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যখন পঠন পাঠন হতো এবং দূষণের কারণে সল্টলেকে কলেজ যখন স্থানান্তরিত হলো তখন থেকেই ছাত্রদের হাতে কলমে চামড়া তৈরি শেখার সুযোগ শেষ হয়। শোনা গেছে যে বানতলা চর্মনগরীতে যে বিশাল ভবন তিন নম্বর জোনে তৈরি করেছে সরকার তা কলেজকে হস্তান্তর করবে। কিন্তু এখন এ বিষয়ে কোনো সাড়া শব্দ নেই সরকারের তরফে। এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব সরকার, কলেজ কর্তৃপক্ষ ও বিশবিদ্যালয়। প্রসঙ্গত, বর্তমানে এই কলেজে পড়াশোনা হয় মৌলানা আবুল কালম আজাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। নাম কা ওয়াস্তে ট্যানারি ল্যাবরেটরির হাতেকলমে শিক্ষাদান বিষয়ে বলা হয়েছে ছাত্ররা চর্মকগরীতে চালু ট্যানারিতে গিয়ে শিখবে। কিন্তু ফি বছর কোনো ছাত্র তালিম নেয় না। তাই মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এই বিষয়ে চিন্তা করে জরুরি পদক্ষেপ করেন। ১৯১৯ সালে স্যার বিএম দাসের প্রচেষ্টায় নির্মিত এই প্রতিষ্ঠানটি দেশে চর্মকরিগরি শিক্ষার একটি অগ্রণী এবং কলকাতার অনেক প্রথমের একটি প্রতিষ্ঠান।

—**তারক সাহা,**
১১সি, শীতলাতলা লেন, হিন্দমোটর, হুগলী।

ভূস্বর্গ কাশ্মীর ও রাষ্ট্রনীতি

পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গিরা আজ আর নিজেদের বিষ কাশ্মীরে ছড়িয়ে দিতে পারছে না। ফলে কাশ্মীরের সাধারণ জনজীবন স্বাভাবিক গতিতেই চলছে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মতো। তবুও কাশ্মীরকে অশান্ত রাখতে বাম মদতপুষ্ট দেশদ্রেহীরা প্রচেষ্টারত রয়েছে এবং সুযোগ বুঝে আঘাত হানছে সাধারণ কাশ্মীরিদের ওপর। কিন্তু এবার তারা সন্ত্রাসী আঘাতের পর নিশ্চিন্তে নিজেদের ডেরায় লুকিয়ে থাকতে পারছে না। কারণ ভারতীয় জওয়ানরা এবার পূর্ণ বিক্রমে প্রত্যাঘাত করছে এবং কড়া হাতে এই সন্ত্রাসীদের খুঁজে খুঁজে নিকেশ করছে, যেভাবে পেস্ট কন্ট্রোলার ছারপোকা বা লুকিয়ে থাকা আরশোলাকে মেরে ফেলে যাতে ঘর বিপদমুক্ত থাকে এবং মানুষ নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করতে পারে।

৩৭০ ধারা বিলোপ ও কাশ্মীরে শান্তি স্থাপনের জন্য ভারতীয় সেনার সক্রিয় ভূমিকা দেখে কংগ্রেস আর তাদের বামপন্থী বন্ধুরা হায় হায় আর্তনাদ করছে। আবার কখনো তীব্র সমালোচনা করছে ভারতীয় সেনার কাশ্মীর রক্ষায় যথাযথ ভূমিকা দেখে। তাদের মতে সেনাবাহিনীর ভূমিকা মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিপূরক। হাস্যকর যদিও! নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু থেকে শুরু করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু থেকে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সকলেই ভারত মায়ের সন্তান। তাই অশ্রদ্ধা কারোর প্রতি থাকার কথা নয়। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রীরা সর্বদা কাশ্মীর সমস্যাকে উপেক্ষা করে গেছেন অথবা বলা যায় যে আপোশ করে গেছেন। হয়তো কংগ্রেসিদের কাছে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে আপোশ করে শান্তি স্থাপন তাদের কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের নীতি ছিল। তাই নব্বইয়ের দশকে শত শত কাশ্মীরি হিন্দুকে যখন নির্বিচারে হত্যা করা হলো, গৃহহীন করা হলো হাজার হাজার হিন্দুকে তখনো কংগ্রেসি সরকার কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কাছে হাঁটু গেড়ে মাথা নত করলেন এই আশায়, হয়তো এই বিভীষিকাময় নরসংহারের পর বিচ্ছিন্নতাবাদীরা শান্ত হবে এবং কাশ্মীরে শান্তি ফিরে আসবে। সেই জন্য হয়তো কাশ্মীরের হিন্দু নরসংহারের খলনায়ক ইয়াসিন মালিককে ডেকে জামাই আদর করেছিলেন তৎকালীন কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ। আর কংগ্রেসের এই নির্লজ্জ আত্মসমর্পণে নগ্ন উল্লাস দেখিয়েছিলেন অরুন্ধতী রায়ের মতো অতিবামেরা। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পরই ৩৭০ ধারা বিলোপ করে কাশ্মীরকে ভারতের মধ্যে স্বাভাবিক রাজ্য হিসেবে মর্যাদা প্রদান করেন। যার ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ হয় পাকিস্তান। পাকিস্তান তার স্বভাব অনুযায়ী কাশ্মীরকে অশান্ত করতে নানা প্রয়াস করতে চেষ্টা করে। পাকিস্তানের মদতে কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসী গোষ্ঠী পুনরায় কাশ্মীরকে মৃত্যুপুরী বানাতে উঠে পড়ে লাগে। কিন্তু এবার দেশের প্রধান অন্য, তাই মোদীজী আপোশের পথে না গিয়ে সন্ত্রাসবাদ দমনের পথে হাঁটলেন। প্রধানমন্ত্রীর এই বীরোচিত পদক্ষেপে স্বাধীনতার পর প্রথমবার কাশ্মীরের ভারতীয় জওয়ানরা উজ্জীবিত হয় এবং তারা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত শুরু করে। ফলস্বরূপ আজ কাশ্মীরে সন্ত্রাসী আক্রমণ করার আগে বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসবাদীরা দশবার ভাববে। কাশ্মীরের স্বাভাবিক জীবন ফিরে এসেছে। দেশ ও বিদেশের পর্যটকরা আজ কাশ্মীরে শান্তিতে ভ্রমণ করছে। যার ফলে সাধারণ কাশ্মীরিদের আর্থিক সমৃদ্ধি হচ্ছে। ভূস্বর্গ আবার স্বমহিমায় মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। পরিশেষে এটাই বলার, যে আপোশের পথে এগোতে গিয়ে কংগ্রেস বিফল হয়েছে, আজ বিজেপির কঠোর নীতিতেই কাশ্মীরে শান্তি ফিরে এসেছে। সুতরাং কাশ্মীর নিয়ে মোদীজী তথা বিজেপির নীতিই যে সফল তা আজ সমগ্র বিশ্বের কাছে প্রমাণিত ও সমাদৃত।

—**শুভ শীল,**
শিলিগুড়ি।

মহিলা ক্ষমতায়নের সহায়ক প্রকল্পগুলি

সুতপ বসাক ভড়

আমাদের দেশের প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ নাগরিক হলেন মহিলা। অর্থনৈতিক- সামাজিক স্থিতি অনুসারে তাঁদের কল্যাণার্থে কেন্দ্র সরকারের থেকে কিছু প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে সেগুলি মহিলা ক্ষমতায়নে সাহায্য করছে। এইরকম কয়েকটি প্রকল্পের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা : এই প্রকল্পের শুভারম্ভ হয় ২০১৫ সালের ৮ এপ্রিল। এটি মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে সাহায্যকারী। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ছিল মহিলা উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়ন ও তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। এই প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক সুবিধাভোগী মহিলা ৫ থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতে পারেন। পরিসংখ্যান অনুসারে, প্রকল্পটির অধীনে এই বছরে ২০২২ সালের ১৮ মার্চ পর্যন্ত ৩৪.২৮ কোটির বেশি ঋণ দেওয়া হয়েছে। এই ঋণের মূল্য ১৮.৫২ লক্ষ কোটি টাকা। একটি জাতীয় সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ২০১৫ ও ২০১৮ সালের মধ্যে এটি ১.১২ কোটি চাকরি তৈরি করতে সহায়তা করেছে। এর মধ্যে ৬৮.৯২ মহিলা (৬২ শতাংশ) নিযুক্তি পেয়েছেন।

মহিলা উদ্যোক্তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং তাদের দ্বারা স্টার্টআপ :

২০১৮ সালের আগস্ট মাসে এই প্রকল্পটি শুরু হয়। মহিলারা যাতে নতুন ব্যবসা শুরু করতে পারেন, সেজন্য ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলির প্রয়োজনীয় দেখাশোনা ও বৃদ্ধির কর্মসূচি নেওয়া এর মূল উদ্দেশ্য। এজন্য জার্মান সরকারের সহযোগিতায় ও উদ্যোক্তামন্ত্রক, মহিলা উদ্যোক্তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও তার দ্বারা চালিত স্টার্টআপ উদ্যোগ নিয়েছে। উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গনা ও আরও আটটি উত্তর-পূর্ব রাজ্যে প্রচলিত এই ব্যবসাগুলো সম্বন্ধে পরিকল্পিত ভাবে প্রচার চলছে। প্রকল্পটি ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে সমাপ্ত হবে।

বর্তমান স্থিতিতে ২.৫ কোটিরও বেশি সুকন্যা সমৃদ্ধি অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। আবার ০৮.১২.২০২১ পর্যন্ত ৬০,০০০ ব্যবসার ৪৬ শতাংশ স্টার্টআপে অন্ততপক্ষে একজন মহিলা

পরিচালককে আমরা পেয়েছি।

স্ট্যান্ডআপ ইন্ডিয়া প্রকল্পটি ০৫.০৪.২০১৬ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত চলবে। এতে ব্যাংকের প্রত্যেক শাখায় অন্তত একজন তপশিলি জাতি বা উপজাতি পুরুষ-মহিলাকে ১০ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকার মধ্যে ঋণ দিতে হবে। এটি বাধ্যতামূলক। নারীশক্তি কেন্দ্রগুলি মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য ১ নভেম্বর ২০১৭ সাল থেকে চলছে।

উইমেনস টেকনোলজি পার্ক : একটি নির্দিষ্ট এলাকায় মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য ডিজিটাল আর্ট মেকিং ও ক্রাফট ডিজাইনিং, এমব্রয়ডারি, কৃষিবর্জ্য থেকে জ্বালানি তৈরি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

বেটি বাঁচাও---বেটি পড়াও : ২২.০১.২০১৫-তে শুরু হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো লিঙ্গ অনুপাত হ্রাসের প্রবণতা কম করা এবং উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা যাতে মহিলারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত হন। সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে ২০১৪-১৫ সালে জন্মের সময়ে জাতীয় লিঙ্গ অনুপাত ছিল ৯১৮, যা বেড়ে ২০১৯-২০-তে ৯৩৪ ছিল।

মিশন শক্তি : প্রকল্পটির সময়সীমা হলো ২০২১-২০২২ থেকে ২০২৫-২০২৬ পর্যন্ত। এর উদ্দেশ্য হলো মহিলাদের নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও ক্ষমতায়নের জন্য প্রচেষ্টা করা। এর উদ্দেশ্য হলো দৈনন্দিন জীবনচর্যা পালন করে মহিলারা পঞ্চায়েত ও স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে সুযোগ্য নেতৃত্ব দিতে পারেন।

সহজ জীবন যাপনের পরিকল্পনা : উজ্জ্বলা ১ ও ২-তে ন' কোটিরও বেশি সংখ্যক গ্যাস সংযোগ দেওয়া হয়। এটি ০১.০৫.২০১৬-তে শুরু হয়। এর ফলে বর্তমানে রান্নাঘরে ধোঁয়া নেই। মহিলাদের স্বাস্থ্যের ওপরেও এর উল্লেখযোগ্য প্রভাব দেখা গেছে। মাতৃত্বকলীন ছুটি ১২ সপ্তাহের পরিবর্তে ২৬ সপ্তাহ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় মহিলা আবেদনকারীদের জন্য অগ্রাধিকার সুনিশ্চিত করা হয়ে থাকে।

০১.০৪.২০১৫ থেকে সখী-ওয়ান-স্টপ শুরু হয়। এখানে হিংসার শিকার মহিলারা পুলিশি নিরাপত্তা, আইনি সহায়তা, কাউন্সেলিং ও চিকিৎসা সহায়তা সহজেই পেয়ে থাকেন।

স্বধার গৃহপ্রকল্প শুরু হয় ০১.০৪.২০১৬ সালে দুঃস্থ মহিলাদের পুনর্বাসন সুবিধা দেওয়ার জন্য। কেন্দ্রীয় সরকার ৩১.৮.২০১৮-তে উত্তরপ্রদেশের বৃন্দাবনে কৃষ্ণকুঠীর গৃহনির্মাণ করেছে। ০১.০৮.২০১৯-এ তিনতালাক আইন পাশ হয়ে মুসলমান মহিলাদের মধ্যে অকস্মাৎ বিবাহবিচ্ছেদের সম্ভাবনা নির্মূল হয়েছে। মহিলারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নানান কল্যাণমূলক কার্যে যুক্ত আছেন। তাঁদের সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলি সহায়ক হয়ে উঠবে— এই আশা রইল। □

জন্ডিসের পেছনে কারণগুলো জানুন

বিশ্রাম ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় সুফল

ডা: পার্থসারথি মল্লিক

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জন্ডিস খুবই প্রচলিত অসুখ। আমাদের দেশও যেহেতু গ্রীষ্মপ্রধান, তাই এই দেশের মানুষ এই রোগে ভুলে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে জন্ডিস কোনো রোগ নয়। এটি রোগের লক্ষণ বা উপসর্গ মাত্র। অভিস বলতে বুঝায় লিভারের যে কোনো জটিলতার কারণে চোখ হলুদ হওয়া, প্রস্রাব হলুদ হওয়া, খাওয়ায় অরুচি, মুখগহ্বর হলুদ হওয়া এবং কারও কারও ক্ষেত্রে চামড়া পর্যন্ত হলুদ হয়ে যাওয়া। এসবকে জন্ডিসের লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে জন্ডিস হলে লিভার কোনো না কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বা আক্রান্ত হয়।

লিভারের ক্ষতি : ভাইরাস থেকে শুরু করে নানান ধরনের ওষুধ, অ্যালকোহল ইত্যাদি কারণে লিভারে প্রদাহ হতে পারে। আমাদের দেশে লিভার প্রদাহের প্রধান কারণ হেপাটাইটিস ই, এ এবং বি ভাইরাস। এর মধ্যে প্রথম দুটি জল ও খাদ্যবাহিত, আর তৃতীয়টি ছড়ায় মূলত রক্তের মাধ্যমে। হেপাটাইটিস এ ভাইরাস প্রধানত শিশুদের জন্ডিসের কারণ। তবে যে কোনো বয়সের মানুষই হেপাটাইটিস ই এবং বি ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারেন।

ভুল চিকিৎসা নয় : জন্ডিস যেহেতু কোনো রোগ নয়, তাই এর নির্দিষ্ট কোনো ওষুধ নেই। ৭ থেকে ২৮ দিনের মধ্যে রক্তে বিলিরুবিনের পরিমাণ স্বাভাবিক হয়ে গেলে জন্ডিস এমনিতেই সেরে যায়। এই সময়টাতে খুব বেশি করে দরকার বিশ্রাম। বলা যায়, বিশ্রামই এই রোগের চিকিৎসা। ব্যথার ওষুধ যেমন প্যারাসিটামল, অ্যাসপিরিন, ঘুমের ওষুধ সহ অন্য কোনো অপ্রয়োজনীয় ও কবিরাজি ওষুধ খাওয়া মোটেও উচিত নয়। এককথায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনো ওষুধই সেবন করা ঠিক নয়। এতে হিতে বিপরীত হওয়ার ঝুঁকিটাই বেশি থাকে।

যা খাবেন প্রতিদিন : পরিমাণমতো বাদাম খেতে পারেন। সামান্য আদা কুচি বা রসুন কুচি, আদার রস বা আদা-চা খাওয়া যেতে পারে দিনে দু-একবার। এগুলো যকৃতের জন্য ভালো। প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ জল পান করতে হবে। অন্তত আট গ্লাস জল খান। তবে অতিরিক্ত জল পানের প্রয়োজন নেই। জল শরীর থেকে ক্ষতিকর টক্সিন বের করে দেয়। আখের রস, ডাবের জলও শরীরে জলের চাহিদা পূরণ করে। তবে রাস্তার পাশের আখের শরবত না পান করে ঘরে তৈরি শরবত খেতে হবে। বাতাবি লেবুর রস জন্ডিস রোগীর জন্য খুবই ভালো। এগুলো শরীরে জলের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। অবশ্য জন্ডিসের সময় বাতাবি লেবু খাওয়া আমাদের বাঙালি ঘরের পুরনো রীতি। মাছ, মুরগির মাংস, ডাল পরিমাণতো খেতে হবে। না হলে রোগী দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। অনেকে মনে করেন, জন্ডিসে আক্রান্ত রোগী মাছ-মাংস জাতীয় খাবার খেতে পারবেন না। এটা মারাত্মক ভুল ধারণা। কার্বোহাইড্রেটের চাহিদা পূরণে বাদামি চাল, রুটি, ওটস খেতে পারেন। গোটা শস্যে প্রচুর আঁশ, ভিটামিন থাকে, যা ক্ষতিকর টক্সিন বের করে দেয়। এছাড়া মিষ্টিকুমড়ো, মিষ্টি আলু, মুলো, বিট, গাজর, টমেটো, ব্রোকলি, ফুলকপি, বাঁধাকপি ও পালং শাক জন্ডিস রোগীর জন্য খুব ভালো। পেঁপে, তরমুজ, আনারস, পাকা আম, কলা, কমলা, জলপাই প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় রাখতে পারেন।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা : কারণ, লক্ষ্মণ মিলিয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করলে জন্ডিসের সুফল মেলে। আমরা যে সমস্ত ওষুধ ব্যবহার করে সুফল পেয়েছি, সেগুলো হল লাইকোপডিয়াম, চেলিডোনিয়াম, কার্বোবেজ প্রভৃতি। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ ব্যবহার করবেন না।

স্কন্দপুরাণে রয়েছে জ্ঞানকূপের উল্লেখ

অভিরূপ গঙ্গোপাধ্যায়

জ্ঞানবাপী হিন্দুদের কাছে কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? এ প্রশ্নের উত্তর হলো, অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম স্কন্দপুরাণে রয়েছে জ্ঞানবাপী ও জ্ঞানকূপের উল্লেখ। স্কন্দ জানতে চাওয়ায় ঋষি অগস্ত্য বলেছেন, স্বয়ং শিব কাশী শহরের পত্তন করেছেন। এবং এই শহরে শিব ও পার্বতী চির বিরাজমান। সুতরাং বোঝাই যায় শহরটি কালক্রমে হিন্দুদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান হয়ে উঠবে। এখানে রয়েছেন দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গমের অন্যতম বিশ্বনাথ বা বিশ্বেশ্বর। মোগল আমলে আওরঙ্গজেব কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংস করে সেখানে জ্ঞানবাপী মসজিদের নির্মাণ করেন। সম্প্রতি জ্ঞানবাপী মসজিদ নিয়ে শুরু হয়েছে আইনি বিতর্ক। হিন্দু পক্ষের দাবি, এখন যেখানে জ্ঞানবাপী মসজিদ সেখানেই ছিল মূল বিশ্বনাথ মন্দির। প্রশ্ন হলো, কতটা ন্যায্য এই দাবি? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা খুঁজব স্কন্দপুরাণে।

স্কন্দপুরাণে আছে মোট সাতটি খণ্ড। মহেশ্বর খণ্ড, বৈষ্ণব খণ্ড, ব্রহ্ম খণ্ড, কাশী খণ্ড, অবন্তিকা খণ্ড, নগর খণ্ড ও প্রভাষ খণ্ড। আমাদের আলোচনা কাশী খণ্ডেই সীমাবদ্ধ। এই খণ্ডেই রয়েছে কাশী সম্বন্ধে ইতিহাসের সব থেকে প্রাচীন তথ্য। উল্লেখ্য, রামজন্মভূমি মামলাতেও স্কন্দপুরাণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এই কাশী খণ্ডে প্রায় হাজার শ্লোক আছে। আমরা এখানে মোট পাঁচটি বিন্দু নিয়ে আলোচনা করব যা জ্ঞানবাপীর গুরুত্ব বুঝতে সাহায্য করবে।

প্রথমেই জানা দরকার, এই শহরের নাম কাশী হওয়ার কারণ কী? স্কন্দের এই প্রশ্নের উত্তরে অগস্ত্য জানাচ্ছেন, এই শহর পাঁচটি নামে পরিচিত। বারাণসী, কাশী, রুদ্রবাসম্, আনন্দকারণম্, অভিমুক্তক্ষেত্রম্, মহাশ্মশানম্। প্রশ্ন হলো, কাশীর এরকম নামকরণ কেন? যদিও আমরা এখানে কাশী ও অভিমুক্তক্ষেত্রম্ এই দুটি নামের তাৎপর্য নিয়েই আলোচনা করব।

স্কন্দপুরণ অনুযায়ী বহু প্রাচীনকাল থেকেই

কাশীক্ষেত্র নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল। এই উজ্জ্বলতার রেশ 'কাশী' শব্দটির মধ্যেও পাওয়া যাবে। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। 'প্রকাশ' শব্দটির সঙ্গে সকলেই কম-বেশি পরিচিত। এখানে 'প্র' উপসর্গটি 'বিশেষ' অর্থে ব্যবহার করা হয়। 'কাশ' কথাটির অর্থ, যা বিচ্ছুরিত হয়। অর্থাৎ আলো। কাশ থেকেই কাশী। কাশী এমন একটি নগরী যা সেই প্রাচীনকাল থেকে জ্ঞানের আলো দেখিয়ে আসছে। এবার আসা যাক অভিমুক্তক্ষেত্রম্ নামকরণ প্রসঙ্গে। শিব ও পার্বতী এই নগরে সদা বিরাজমান। তাঁরা এই নগর থেকে কোনওদিন নিজেদের মুক্ত করেন না। সেই কারণেই এই শহরের নাম অভিমুক্তক্ষেত্রম্।

কেন মাত্র দুটো নামের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে সেটা কাশীর ভূগোল নিয়ে সংক্ষেপে কয়েকটা কথা বললে ভালোভাবে বোঝা যাবে। স্কন্দপুরাণে কাশীকে মন্দির-নগরী বলা হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই এখানে অসংখ্য মন্দির। এই শহরে স্বয়ম্ভু শিব লিঙ্গরূপে নিজেকে প্রকট করেছেন। এই লিঙ্গ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। কাশী শহরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পাঁচ ক্রোশ। তাই একে পঞ্চক্রোশ কাশী বলা হয়। সব থেকে বড়ো কথা, কাশী শহরের একেবারে মধ্যস্থলে বিশ্বেশ্বর শিবের লিঙ্গরূপ বিরাজমান। শহরের যেখান থেকেই দেখা হোক না কেন এই বিশাল শিবলিঙ্গ ভক্তদের চোখে পড়ে। সেই বিরাট শিবলিঙ্গের কী হয়েছে আমরা জানি না কিন্তু স্কন্দপুরাণ বলছে কাশীর বিশ্বেশ্বর শিবলিঙ্গ এতটাই বড়ো ছিল যে তা পঞ্চক্রোশ কাশীর যে কোনও প্রান্ত থেকে চোখে পড়ত।

এবার জ্ঞানবাপী। অগস্ত্য জানতে চাইলেন, এই কূপকে জ্ঞানবাপী কেন বলা হয়? তিনশো শ্লোকে স্কন্দ দিয়েছেন এই প্রশ্নের উত্তর। ঈশ্বর লিঙ্গরূপ ধারণ করার পর প্রথম কাশীতে প্রকট হন। এই শহরেই রয়েছে ভারতের প্রথম জ্যোতির্লিঙ্গম্। প্রকট হবার পর শিব মাটিতে ত্রিশূল দিয়ে তৈরি করেন এই কূপ যা আজ জ্ঞানবাপী নামে পরিচিত। একে জ্ঞানকূপও বলেন কেউ কেউ। স্কন্দপুরাণ অনুযায়ী এই জ্ঞানকূপ ছিল বিশ্বেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গের দক্ষিণে। অর্থাৎ কূপের উত্তরদিকে অবস্থান করতেন বিশ্বেশ্বর শিব। কাশীর এখনকার মানচিত্র দেখলে পরিষ্কার বোঝা যাবে এখন যেখানে বিশ্বেশ্বর শিব রয়েছেন স্কন্দপুরাণ লেখার সময় সেখানে তিনি থাকতেন না। থাকতেন এখন যেখানে জ্ঞানবাপী মসজিদ, সেখানে। □

পঁচাশি বছর ধরে চলছে জ্ঞানবাপী বিতর্ক

নিখিল চিত্রকর

কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের একাংশ ভেঙে জ্ঞানবাপী মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন ঔরঙ্গজেব। ইন্টারনেটে গুগল উইকিপিডিয়াতেও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে সে বর্বতার ইতিকথা। তার পর কেটে গেছে তিনশো চুয়ান্ন বছর। আক্রমণকারীদের দখলদারি সরাতে স্বয়ম্ভু বিশ্বেশ্বরের নিবেদিত প্রাণ ভক্তরা দ্বারস্থ হয়েছেন আদালতের। চলছে মামলা। দীর্ঘ পঁচাশি বছর ধরে চলা মামলার খুঁটিনাটি তুলে ধরা হলো এখানে।

● বিতর্কিত জ্ঞানবাপী মসজিদ যে আদতে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরেরই অংশ সেই মর্মে প্রথম আবেদনটি দায়ের হয়েছিল ইংরেজ আমলে, ১৯৩৬ সালে। বারাণসী জেলা আদালতে।

● ১৫ আগস্ট ১৯৩৭-এ আদালত বিতর্কিত স্থানে নমাজ পড়ার অনুমতি দেয়।

● ১৯৪২ সালের ১০ এপ্রিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্ত বহাল রাখে এবং হিন্দু পক্ষের আবেদন খারিজ করে দেয়।

● ১৯৯১ সালের ১৫ অক্টোবর। আবেদনকারী পণ্ডিত সোমনাথ ব্যাস (কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের পুরোহিতদের বংশধর) ডঃ রামরঙ্গ শর্মা এবং অন্যরা একটি নতুন মন্দির নির্মাণের জন্য মসজিদের জমি দাবি করে বারাণসী আদালতে মামলা দায়ের করেন। তাঁদের যুক্তি ছিল যে, প্লেস অব ওয়রশিপ ১৯৯১ অ্যাক্ট বা পূজার স্থান (বিশেষ বিধান) আইন মসজিদের জন্য প্রযোজ্য নয়। কারণ এটি পুরোনো বিশ্বেশ্বর মন্দিরের অবশিষ্টাংশের ওপর নির্মিত বলে অভিযোগ উঠেছে।

● ১৯৯৮ সালে হাইকোর্টে হিন্দুপক্ষের আবেদনের বিরুদ্ধে লক্ষ্ণৌয়ে দুটি পৃথক পিটিশন দায়ের করে আঞ্জুমান ইন্তিজানিয়া মসজিদ ও ইউপি সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড।

● ৭ মার্চ, ২০০০ সালে পণ্ডিত সোমনাথ ব্যাস মারা যান।

● ২০১৮ সালে বিতর্কিত জ্ঞানবাপী মসজিদ মামলায় প্রাক্তন সরকারি কৌঁসুলি বিজয় শঙ্কর রস্তোগীর নাম নথিভুক্ত হয় একজন মামলাকারী হিসেবে। তিনি দাবি করেন, পুরাতাত্ত্বিক সমীক্ষা চালানো হোক গোটা জ্ঞানবাপী এলাকা জুড়ে।

● ২০২০ সালে আইএসআই-এর বিরুদ্ধে কোমর বাঁধে আঞ্জুমান মসজিদ কমিটি। ওই বছরই নিম্ন আদালতে পুনরায় আবেদন করেন আইনজীবী রস্তোগী। তাঁর দাবি যেহেতু এলাহাবাদ আদালত মামলায় স্থগিতাদেশের সময় বাড়ায়নি, তাই সত্বর শুনানি শুরু হোক।

● ২০২১- এর ৮ এপ্রিল, বারাণসীর একটি স্থানীয় আদালত ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপকে জ্ঞানবাপী মসজিদের একটি সমীক্ষা পরিচালনা করার নির্দেশ দেয়।

● ১৮ এপ্রিল ২০২২- এ পাঁচ মহিলা আবেদনকারী দিল্লির রাখি সিং, বারাণসীর লক্ষ্মী দেবী, সীতা সাহু, রেখা পাঠক ও মঞ্জু ব্যাস বিতর্কিত জ্ঞানবাপী মসজিদ চত্বরে শৃঙ্গার গৌরীর পূজো করার অনুমতি চেয়ে আদালতের কড়া নাড়েন। প্রসঙ্গত, এর আগে বছরে মাত্র একবার শৃঙ্গার গৌরী মন্দির খুলে দেওয়া হতো। বাকি ৩৬৪ দিন বন্ধ থাকতো। মঞ্জু ব্যাস-সহ পাঁচ হিন্দু মহিলা সারা বছর শৃঙ্গার গৌরীর পুজো দেওয়ার আর্জি জানান আদালতে।

● ২০২২- এর মে মাসের গোড়ার দিকে ওই পাঁচ হিন্দু মহিলার আর্জি বিবেচনা করে জ্ঞানবাপী মসজিদ অঞ্চলে সমীক্ষার নির্দেশ দেয় এলাহাবাদ হাইকোর্ট। সমীক্ষা শুরু হয় এবং তিনদিন ধরে চলে।

● ১৬ মে ২০২২, আদালত নির্দেশিত সমীক্ষা শেষ হয়। জ্ঞানবাপী মসজিদের ওজুখানার ভিতরে থাকা কুয়ো থেকে উদ্ধার হলো ১২ ফুট দৈর্ঘ্যের শিবলিঙ্গ। মামলাটি বিচারাধীন হওয়ায় সমীক্ষার তথ্য গোপন রাখা হয়। হিন্দুপক্ষের অন্যতম আইনজীবী মদন মোহন যাদব দাবি করেন যে শিবলিঙ্গটি বিশ্বনাথ মন্দিরের নন্দীর মুখোমুখি। শিবলিঙ্গ পাওয়ার দাবির পর জায়গাটি সিল করার নির্দেশ জারি করে আদালত। এবং সেই জায়গার সুরক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয় জেলা প্রশাসন ও সিআরপিএফকে।

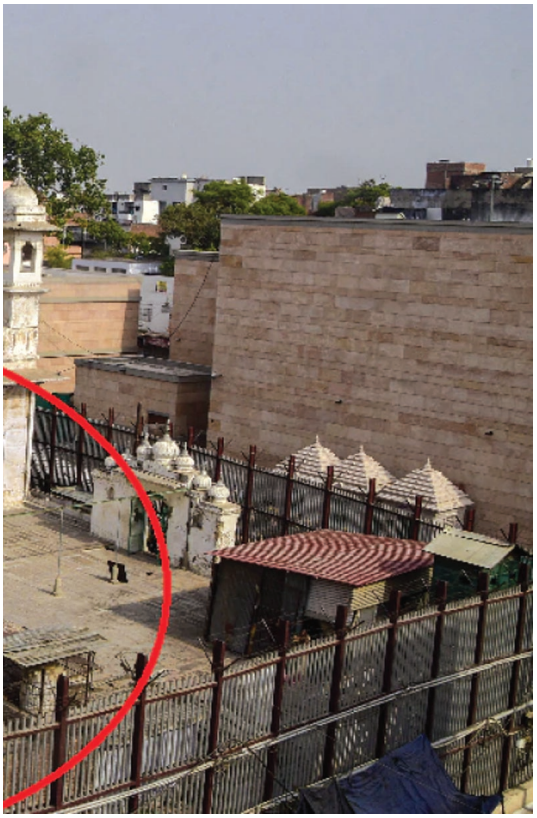

● এলাহাবাদ হাইকোর্ট নির্দেশিত সমীক্ষা-রিপোর্টকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে জ্ঞানবাপী মসজিদ কর্তৃপক্ষ।

● ১৯ মে ২০২২ সর্বোচ্চ আদালত মামলা ফেরত পাঠালো নিম্ন আদালতে। মামলার দায়িত্বে এলেন জেলা বিচারপতি।

● ২৩ মে এই মামলার শুনানি হয় বারাণসী আদালতের অজয়কৃষ্ণ বিশ্বেশের এজলাসে। হিন্দুপক্ষের তরফে পেশ করা আর্জিগুলো ছিল-

(ক) জ্ঞানবাপী কমপ্লেক্সে শৃঙ্গার গৌরীর নিত্য পুজো।

(খ) জ্ঞানবাপী মসজিদের ওজুখানায় পাওয়া শিবলিঙ্গের পুজোর অনুমতি।

(গ) শিবলিঙ্গের নীচে ঘরের দিকে যাওয়ার পথের ধ্বংসাবশেষের অপসারণ।

(ঘ) শিবলিঙ্গের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের সমীক্ষা।

(ঙ) বিকল্প ওজুখানার ব্যবস্থা করা।

এই মামলায় পরবর্তী শুনানির তারিখ নির্ধারিত হয় ২৬ মে।

● ২৬ মে ২০২২, দুপক্ষের দাবিদাওয়া শুনে পরবর্তী ৩০ মে পুনরায় শুনানির দিন ঘোষণা করা হয়েছে। ■

প্লেস অব ওয়রশিপ অ্যাক্ট, ১৯৯১

জ্ঞানবাপী বিতর্কে মসজিদ পরিচালন সমিতি তাদের আবেদনে প্লেস অব ওয়রশিপ অ্যাক্ট, ১৯৯১-এর কথা উল্লেখ করেছে। আইনটি ১৯৯১ সালে নরসিংহ রাও সরকার তৈরি করেছিল। এই আইন অনুযায়ী, ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ দেশের সব পুরনো মন্দির, মসজিদ, গির্জা, গুরুদোয়ারা যে অবস্থায় ছিল তা সেভাবেই থাকবে। কোনও পরিবর্তন করা যাবে না। পরিবর্তন চেয়ে করা নাগরিকদের আবেদন দেশের কোনও আদালত গ্রহণ করবে না। সেই কারণেই জ্ঞানবাপী মসজিদ কর্তৃপক্ষ আইনটিকে রক্ষাকবচ বানিয়ে আদালতের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে চাইছেন। কিন্তু আইনজীবী অশ্বিনী উপাধ্যায় আইনটির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। সুপ্রিম কোর্টে দাখিল করা এক পিটিশনে তিনি জানিয়েছেন এই আইন বহিরাগত হামলাবাজ মুসলমানদের অপরাধকে বৈধতা দিতেই তৈরি করা হয়েছে। তাঁর মতে সেইসব উপাসনাস্থলই আইনি নিরাপত্তা পাওয়ার যোগ্য যা আইন মেনে তৈরি করা হয়েছে, বেআইনি ভাবে তৈরি করা উপাসনাস্থল আইনি নিরাপত্তা পাওয়ার যোগ্য নয়। এখানে 'কাট অফ ডেট' হিসেবে ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭-এর উল্লেখ একেবারেই অযৌক্তিক। তিনি তাঁর আবেদনে স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, আইনসঙ্গত উপায়ে জমি কিনে যদি না তাতে মসজিদ বানানো হয়ে থাকে তা হলে সেই মসজিদের ওপর মুসলমানদের কোনও অধিকারই থাকতে পারে না। কোনও মন্দিরের ছাদ, দেওয়াল, থাম বা ভিত ভেঙে ফেললে বা সেখানে নমাজ পড়লে সেই মন্দিরের ধর্মীয় চরিত্র বদলে যায় না। একবার কোনও সম্পত্তি দেবতার বলে গণ্য হলে তা চিরকাল দেবতারই থেকে যায়। এমনকী, যদি সেই সম্পত্তি জোর করে কেউ পাঁচশো বছর দখল করে বসে থাকে তাহলেও সেই সম্পত্তি দেবতারই থাকে, মসজিদের হয়ে যায় না। এছাড়া, তিনি এই আইন প্রণয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের আদৌ কোনও অধিকার আছে কিনা, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর যুক্তি, উপাসনাস্থলের রক্ষণাবেক্ষণ রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়। অর্থাৎ কোনও উপাসনাস্থলের ধর্মীয় চরিত্র নির্ধারণে আদালতের হস্তক্ষেপ জরুরি কিনা তা কেন্দ্র ঠিক করতে পারে না।

মসজিদের ভেতর ছবি তুলতে দিতে মুসলমানদের আপত্তি কেন

চন্দ্রভানু ঘোষাল

ইন্টারনেটে দেখা যাচ্ছে, মসজিদের ভেতরের ছবি কেউ তুলতে চাইলে, তুলতে পারেন। ইসলামিক আইনে ছবি তোলায় কোনও বাধা নেই। শুধু নমাজ পাঠরত মুমিনদের ছবি তোলা বারণ। অথচ বারাণসীর সিভিল কোর্ট থেকে শুরু করে সুপ্রিম কোর্ট যখন জ্ঞানবাপী মসজিদের ভেতরে সার্ভে করার এবং ভিডিয়োগ্রাফি ও ফোটোগ্রাফি করার নির্দেশ দিল তখন মসজিদ পরিচালন সমিতি তো বটেই, সেই সঙ্গে সারা দেশের অনেক মুসলমান ও সেকুলার নেতারা রে রে করে উঠলেন। সবারই এক রা, ছবি তোলা যাবে না। স্বাভাবিক ভাবেই একটা প্রশ্ন উঠেছে, মন্দির পরিচালন সমিতি যদি সব সত্যি কথাই বলে থাকেন অর্থাৎ জ্ঞানবাপী মসজিদের ভেতর হিন্দু মন্দিরের কোনও চিহ্নই নেই— তাহলে ছবি তুলতে দিতে চাইছেন না কেন? তবে কি ওরা সত্যি কথা বলছেন না?

সত্যি কথা যে ওরা বলেননি তার প্রমাণ সারা বিশ্ব পেয়েছে। কিন্তু সেই প্রমাণ গোপন করার জন্য বা নষ্ট করে ফেলার জন্য মসজিদ কর্তৃপক্ষ কতটা মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন সেটা একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে। আদালত ভিডিয়োগ্রাফি করার নির্দেশ দেবার পর আঞ্জুমান ইনতেজামিয়া মসজিদের (জ্ঞানবাপী মসজিদ) ম্যানেজিং কমিটির যুগ্ম সচিব এস.এম. ইয়াসিন বলেন, 'আমরা মসজিদের ভেতর সার্ভে, ভিডিয়োগ্রাফি করতে দেব না। দরকার হলে মসজিদের ম্যানেজিং কমিটি আদালতের রায়ের বিরোধিতা করবে। এই বিরোধিতা আমরা লাগাতার চালিয়ে যাব।' স্বাভাবিক ভাবেই সারা দেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সর্বভারতীয় মুখপাত্র বিনোদ বনসল বলেন, 'এটা পরিষ্কার আদালত অবমাননা। ওরা কীভাবে আদালতের নির্দেশ অমান্য করে মসজিদে সার্ভে এবং ভিডিয়োগ্রাফিতে বাধা দিতে পারে?' তিনি সরাসরি প্রশ্ন তোলেন, 'আপনারা কী আড়াল করতে চাইছেন? জ্ঞানবাপী মসজিদ কোনও রেস্ট্রিকটেড এরিয়া নয় যে সেখানে যাওয়া যাবে না।'

মসজিদ কর্তৃপক্ষ যে কিছু আড়াল করতে চাইছিলেন সেটা বোঝা গেল কয়েকদিন পর। অ্যাডভোকেট কমিশনার অজয়কুমার মিশ্র ও তার টিমের পর্যবেক্ষণে উঠে এল নতুন তথ্য। জানা গেল, জ্ঞানবাপী মসজিদের দেওয়ালে দেওয়ালে এমন কিছু অলংকরণ এখনও আছে যার সঙ্গে ইসলামের কোনও সম্পর্ক নেই। বরং এইসব চিহ্ন সরাসরি সনাতন ধর্মের দিকে ইঙ্গিত করে। হিন্দু পক্ষ দাবি করায় এও জানা গেল, পাওয়া গেছে একটি শিবলিঙ্গ।

ফোয়ারা তত্ত্ব : পর্যবেক্ষক দলের সদস্যরা যখন শিবলিঙ্গের ব্যাপারে নিঃসংশয় তখন মসজিদ কর্তৃপক্ষ বলেন, ওটা ফোয়ারা। কিন্তু এখন অকেজো। কতদিন ধরে অকেজো? উত্তরে তারা কেউ বলেন বারো বছর, কেউ বলেন তিরিশ বছর। যদিও ফোয়ারায় জল আসা এবং বেরিয়ে যাওয়ার জন্য কোনও পাইপলাইন কেন

নেই— এ প্রশ্নের উত্তর তারা দিতে পারেননি। তবে হিন্দু পক্ষের আইনজীবী বিষ্ণুশঙ্কর জৈন স্পষ্ট জানিয়েছেন, শিবলিঙ্গকে ফোয়ারা বানাবার চেষ্টা করা হয়েছিল। লিঙ্গের গায়ে ড্রিলিং মেশিন দিয়ে গর্ত করার দাগ পাওয়া গেছে। শিবলিঙ্গটি যাতে ফোয়ারার মতো দেখতে লাগে তার জন্য একটি ছিদ্রযুক্ত চাকতি লিঙ্গের মাথায় বসানোর চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও বসাতে পারেনি, চাকতিটি পাওয়া গেছে মসজিদের গুদামে। চাকতি বসানোর জন্য যে প্ল্যাটফর্ম দরকার তারও সন্ধান পাওয়া গেছে লিঙ্গের মাথায়। বিষ্ণু শঙ্কর জৈন জানিয়েছেন, শুধুমাত্র এই প্ল্যাটফর্মটির কারণেই শিবলিঙ্গটি অন্যরকম দেখতে হয়ে গেছে। কেউ কেউ সোশ্যাল মিডিয়ায় শিবলিঙ্গের ছবি পোস্ট করে প্রশ্ন তুলেছেন, এটা সত্যি শিবলিঙ্গ তো? মানুষের মনে এই সন্দেহ ঢুকিয়ে দেওয়াই ছিল মসজিদ কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য।

তথ্য ফাঁস : এর মধ্যে ঘটে গেছে আরেকটি ঘটনা। হঠাৎ জানা গেল, পর্যবেক্ষক দল মসজিদের ভেতরে গিয়ে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তার কিছু অংশ ফাঁস হয়ে গেছে। অভিযোগ পাওয়ার পর আদালত অজয় কুমার মিশ্রকে সরিয়ে দেয়। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন বিশাল সিংহ। তিনি নতুন করে সার্ভে করেন। বিশাল সিংহ জানিয়েছেন, তথ্য ফাঁসের অভিযোগ সঠিক নয়। অজয় কুমার মিশ্র নির্ধারিত সময়েই সব তথ্য আদালতে জমা দিয়েছেন। তখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ ওঠেনি। আদালতে জমা দেওয়ার পর সব তথ্যই পাবলিক হয়ে যায়। এরপর ফাঁস হলেও তাকে আইনবিরুদ্ধ বলা যাবে না।

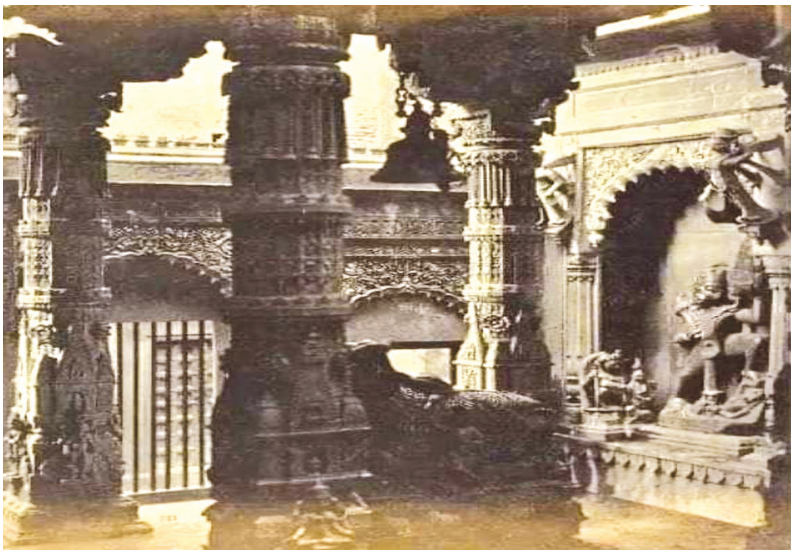

১৮৬৪ সালে স্যামুয়েল বোর্নের তোলা ছবিতে তখনকার জ্ঞানবাপী।

জ্ঞানবাপী যে আদতে একটি মন্দির সেকথা উঠে এসেছে একাধিক বিদ্বজ্জনের বক্তব্যে

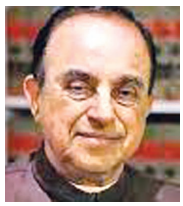

সুব্রহ্মনিয়াম স্বামী

সুব্রহ্মনিয়াম স্বামী বলেছেন, মন্দির ভেঙে মসজিদ বানানোর ইতিহাসকে যারা এতদিন গালগপ্প বলে উড়িয়ে দিতেন তারা উচিত শিক্ষা পেয়েছেন। আরও বলেন, '১৯৯৪ সালে সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ রায় দিয়েছিল যে মসজিদ ভাঙা যেতে পারে, অন্য কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। ইসলামিক শাসনে তো বটেই, ব্রিটিশ আমলেও এরকম অনেকবার হয়েছে। কারণ মসজিদ শুধু নমাজ পড়ার জায়গা, যা যে কোনও জায়গায় পড়া যেতে পারে।

তারেক ফতেহ্

তারেক ফতেহ্ একটি টুইট করেছেন। সেটি এরকম :

'জ্ঞানবাপী মসজিদ না মন্দির? আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ইসলামে বিশ্বাসী প্রাক্তন রিজিওনাল ডিরেক্টর কে.কে. মহম্মদ বলেছিলেন, মুসলমানেরা হিন্দুদের প্রতি তাদের পূর্বপুরুষদের করা ঐতিহাসিক অপরাধগুলোর জন্য আগে ক্ষমা চাক। তারপর যা করার তা করা যাবে।'

মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরির আরও পাঁচটি দৃষ্টান্ত

এককালে যেখানে সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণের অনুরণন হতো, যেসব বৈদিক সাধনস্থল আজও কায়েমি ইসলামি সাম্রাজ্যবাদের কলঙ্ক চিহ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরের বুনিয়াদের উপর মসজিদ খাড়া করার উদাহরণ এদেশে ভুরি ভুরি। সেইসব বিতর্কিত মসজিদের কয়েকটা এখানে উল্লেখ করা হলো।

● আদিনাথ মন্দির < আদিনা মসজিদ

১৩৫৮-৯০ শতকে পশ্চিমবঙ্গের মালদার পাণ্ডুয়াতে আদিনাথ শিব মন্দির ভেঙে শিকান্দার শাহ আদিনা মসজিদ নির্মাণ করে। আদিনা মসজিদের প্রবেশদ্বার, অন্দরমহল, দেওয়ালে হিন্দু দেব-দেবীর বিগ্রহের ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান। মসজিদের এক পাথরে শিবের নটরাজ মূর্তি এখনো আছে। অন্য একটি পাথরে দেখা যায় গণেশের মূর্তি। এমনকী আদিনা মসজিদের নামটাও দেবাদিদেব আদিনাথের নাম থেকে নেওয়া হয়েছে।

● ধ্রুবস্তম্ভ < কুতুব মিনার

দিল্লির কুতুব মিনার আসলে ধ্রুবস্তম্ভ বা বিষ্ণু ধ্বজা। যেটি রাজা বিক্রমাদিত্যের আমলে নির্মাণ করা হয়। কথিত আছে, জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার জন্যই মানমন্দির হিসেবে ধ্রুবস্তম্ভের স্থাপনা হয়েছিল। কুতুব মিনারের উপর থেকে দেখলে এটি ২৪টি পাঁপড়ি সমেত একটি পদ্মর মতো দেখায়। পদ্ম ইসলামিক চিহ্ন নয়। বরং এটি বৈদিক চিহ্ন কথিত আছে, ভগবান বিষ্ণুর নাভি কমলে উপবিষ্ট রয়েছেন প্রজাপতি ব্রহ্মা।

● বিজয় মন্দির < বিজামণ্ডল মসজিদ

মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপাল থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বিদিশা একটি ঐতিহাসিক শহর। এক সময়ে পারমার রাজাদের তৈরি একটি হিন্দু মন্দির এখানে অবস্থিত ছিল। বর্তমানে সেটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত। তারই একটি অবশিষ্ট থামে খোদিত তথ্য থেকে জানা যায়, মালওয়ার রাজা নরবর্মন বিজয় মন্দিরটির নির্মাণ করান। মন্দিরে দেবী চর্চিকার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৬৫৮-১৭০৭ সালে বারবার আক্রমণ করে মন্দিরটি গুঁড়িয়ে দেয় ঔরঙ্গজেব। সেই ধ্বংসাবশেষের উপরেই নির্মিত বিজামণ্ডল মসজিদ।

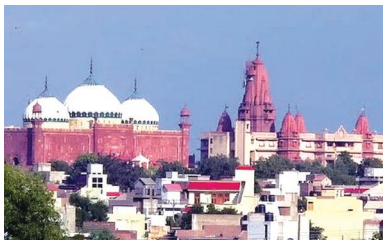

● মথুরার কৃষ্ণ-জন্মভূমি মন্দির < শাহি ইদগাহ মসজিদ

উত্তর প্রদেশের মথুরায় অবস্থিত কৃষ্ণজন্মভূমি মন্দির যা কেশব দেব মন্দির বলেও পরিচিত। আনুমানিক ৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমিতে মন্দির নির্মিত হয়। ঔরঙ্গজেব এই মন্দিরটি ধ্বংস করে তার উপরে শাহি ইদগাহ মসজিদ তৈরি করান। বিতর্কিত শাহি ইদগাহ মসজিদ নিয়ে রাজনৈতিক তর্জা আজও অব্যাহত। তবে মসজিদটি যে কৃষ্ণ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে বানানো হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় এএসআই-এর একটি ফলকে। যেখানে লেখা আছে, যে এই শাহি ইদগাহ মসজিদ বানানো হয়েছে আগের কৃষ্ণ মন্দিরের ভাঙা পাথর ও মূর্তির ভগ্নাংশ দিয়ে।

● রুদ্র মহালয়া মন্দির < জামি মসজিদ

গুজরাটের পাঠান জেলার সিদ্ধপুরে রুদ্র মহালয়া মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। ১২ শতকে সিদ্ধরাজ জয়সিংহ রুদ্র মহালয়া মন্দিরটির স্থাপত্য সম্পূর্ণ করান। মন্দির নির্মাণ শুরু হয়েছিল মুলারাজ সোলাঙ্কির হাত ধরে ৯৪৩ শতকে।

১৪১০ থেকে ১৪৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বহুবার এই মন্দিরটি আক্রমণ করে আলাউদ্দিন খিলজি। আহমেদ শাহের আমলে রুদ্র মহালয়া মন্দির সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করে কিছু অংশ জামি মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়। ■

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে ভারত পরিক্রমায় বাইক র‍্যালি

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গত ২২ মে ভারতজুড়ে ভারত পরিক্রমা কার্যক্রমের অঙ্গ হিসেবে এক বিশাল বাইক র‍্যালির আয়োজন করা হয়। সকাল ৮টা ৫৬ মিনিটে একই সঙ্গে দেশজুড়ে এই র‍্যালির সূচনা হয় যা কন্যাকুমারী থেকে জম্মু-কাশ্মীর এবং মণিপুর থেকে গুজরাট পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় উপযাত্রার আয়োজন করা হয়। তাতে হাজার হাজার যুবক অংশগ্রহণ করেন। একটি শোভাযাত্রা উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলা হয়ে অসমের উদ্দেশে রওনা হয় এবং একটি মেদিনীপুর হয়ে ওড়িশার দিকে চলে যায়। সবকটি যাত্রা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলেও কলকাতার র‍্যালি পুলিশের বাধার মুখে পড়ে।

কলকাতার যাত্রার পরিকল্পনা ছিল, একটি যাত্রা স্বামীজীর পৈতৃক বাসভবন থেকে শ্যামবাজার, বাগবাজার হয়ে গিরিশ পার্কের মধ্যে দিয়ে রাজা রামমোহন রায় রোড ধরে ধর্মতলার উপর দিয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বাসভবনে উপস্থিত হওয়া। আর একটি মাস্টারদা সূর্য সেন মেট্রো স্টেশন থেকে এলগিন রোডের নেতাজীর বাসভবনে উপস্থিত হয়ে একসঙ্গে দুটি যাত্রা রেড রোড ধরে বিবাদী বাগে শেষ করা। কলকাতার পুলিশ প্রশাসন দুটি র‍্যালিকেই আটকানোর প্রাণপণ চেষ্টা করে। কিন্তু উদ্‌যাপন সমিতির নেতৃত্বের দৃঢ়তায় স্বামীজীর বাসভবনের র‍্যালিটি প্রথমে পুলিশ বাধা দিতে সক্ষম হলেও পরে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। কিন্তু মাস্টারদা সূর্য সেনের র‍্যালিটি পুলিশ বন্ধ করে দেয়।

স্বামীজীর পৈতৃক বাসভবনের শোভাযাত্রার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দ পৈতৃক বাসভবনের সম্পাদক পূজ্যপাদ স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ মহারাজ, স্বাধীনতা সংগ্রামী পুলিনবিহারী দাশের নাতি বিশ্বরঞ্জন দাশ, এভারেস্ট জয়ী দেবাশিস বিশ্বাস, অর্জুন পুরস্কার বিজেতা বিশ্বজিৎ পালিত, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ ড. জিষ্ণু বসু, কলকাতা মহানগর সঙ্ঘচালক জয়ন্ত পাল প্রমুখ। অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা হাতে বিপুল উৎসাহে ৬৫০ জন যুবক বাইক-সহ এবং ১২০০ নাগরিক অংশগ্রহণ করেন।

হাওড়া জেলার স্বাধীনতা-৭৫ উদ্‌যাপন সমিতির উদ্যোগে একটি বাইক র‍্যালি ধুলাগড়ী টোল প্লাজা থেকে জাতীয় সড়ক ধরে বাগনান থানার দেউলটি নাউপালাতে শেষ হয়। এই র‍্যালিতে ৩০০ জন যুবক ও ক্রীড়াবিদ বাইক-সহ অংশগ্রহণ করেন। এই যাত্রার সূচনা করেন জাতীয় সড়ক ইনসিডেন্ট ম্যানেজার অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন অশোক পয়রা। বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক কৌশিক প্রামাণিক।

একইভাবে ডালখোলা, ইসলামপুর, শিলিগুড়ি, ময়নাগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, বালুরঘাট, ব্যারাকপুর, দুর্গাপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া, খাতড়া, বোলপুর, তারকেশ্বর, খড়্গপুর, চন্দ্রকোণা রোড ও ঝাড়গ্রামে বাইক র‍্যালির আয়োজন করা হয়। সারা রাজ্যে মোট ৩৮৪২ জন যুবক-যুবতী বাইকে ভারত পরিক্রমা র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানগুলিতে ৬৯০৮ জন বিশিষ্ট নাগরিক উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের প্রদেশ কার্যকারিণী বৈঠক ও অভ্যাস বর্গ

গত ৮ ও ৯ মে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের দুদিন ব্যাপী প্রদেশ কার্যকারিণী বৈঠক ও অভ্যাস বর্গ। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে প্রদীপ প্রজ্বলন ও সরস্বতী বন্দনার মাধ্যমে কার্যক্রমের সূচনা হয়। এরপর জেলা প্রতিনিধিরা নিজ নিজ জেলার প্রতিবেদন পাঠ করেন। বৈঠকে রাজ্যে পাঁচশো বিদ্যালয়ে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

দ্বিতীয় পর্বে শুরু হয় অভ্যাস বর্গ। চয়নিত কার্যকর্তাদের নিয়ে এই বর্গের উদ্বোধন করেন কৃষ্ণনগরের শঙ্কর মিশনের শঙ্করশুদ্ধ চৈতন্য মহারাজ। তিনি বর্তমান সময়ে শিক্ষকদের কার্যপ্রণালী কীরূপ হবে সেই বিষয়ে পথনির্দেশ করেন। অভ্যাস বর্গে দ্বিতীয় ভাগে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মধ্যবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক অতুল কুমার বিশ্বাস। তিনি সংগঠনের রূপ ও ব্যাপকতা সম্পর্কে অবহিত করেন কার্যকর্তাদের। সেইসঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষকরা কীভাবে সংগঠনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবেন সে বিষয়েও তিনি বিস্তারিত আলোকপাত করেন। বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের রাজ্য সভাপতি আশিস কুমার মণ্ডল তাঁর বক্তব্যে কার্যকর্তাদের অনুপ্রাণিত করেন। রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপী প্রামাণিক সংগঠনের রূপ, রীতি ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এরপর টোলি প্রমুখরা টোলির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত করান। অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষক মহাসঙ্ঘের ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক আলোক চট্টোপাধ্যায় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আচরণ সম্পর্কে সচেতন করেন। রাষ্ট্রগীত বন্দেমাতরমের মাধ্যমে অভ্যাস বর্গের সমাপ্তি হয়।

টালিগঞ্জ করুণাময়ীতে বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির স্বাস্থ্য শিবির

গত ১৫ মে টালিগঞ্জের করুণাময়ী কালীবাড়িতে 'করুণাময়ী মা করুণাময়ী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম' ও 'বাস্তুহারা সহায়তা সমিতি'র যৌথ উদ্যোগে এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে ডাঃ প্রদীপ শীল ও ডাঃ পার্থপ্রতীম মুন্সীর তত্ত্বাবধানে ৮১ জনের চক্ষু পরীক্ষা করে ৫৩ জনকে চশমা প্রদান করা হয়। ২৭ জনের হাড়ের ও সাধারণ চিকিৎসা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির পক্ষে জীবনময় বসু। স্থানীয় সমাজসেবী শৈলেন পাল ও ধ্রুব বসু শিবিরে সহায়তা করেন। শ্রীশ্রী মা করুণাময়ী কালীবাড়ির প্রধান সেবাইত শিবির পরিদর্শন করেন।

ভারতীয় সংস্কৃতি সংসদে ভরতনাট্যম্ নৃত্য প্রদর্শন

গত ২২ মে কলকাতায় ভারতীয় সংস্কৃতি সংসদের সভাকক্ষে ভরতনাট্যম্ নৃত্য প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়। সর্বভারতীয় সুপ্রসিদ্ধ নৃত্যাঙ্গনা অরূপা লাহিড়ী একক নৃত্যে উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীকে মন্ত্রমুগ্ধ করে দেন। নৃত্য কীভাবে ঈশ্বর সাধনার মাধ্যম হতে পারে তা শ্রীমতী লাহিড়ী তাঁর নৃত্যের মাধ্যমে দর্শকদের অনুভব করিয়েছেন। তাঁর নৃত্যের অনুপম অঙ্গভঙ্গিমায় দর্শকরা ভাববিভোর হয়ে পড়েন। তিনি অলারিপ্পু থেকে শুরু করে বর্ণম্, তুলসীদাস গোস্বামীর ভজন, কবি জয়দেবের অষ্টপদী এবং সুন্দর দাসের এক কৃতি অপূর্ব ভঙ্গিমায় পরিবেশন করেন।

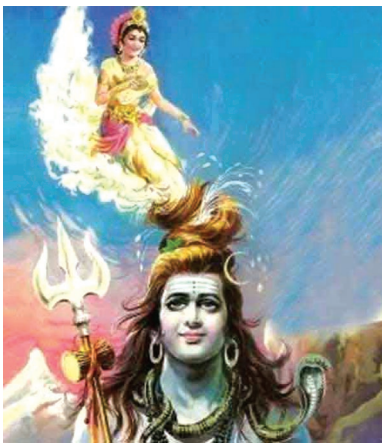

দশহরার দশকাহন

নন্দলাল ভট্টাচার্য

নদী আবার দেবীও : 'আপনি আপন সম্ভবে, যেমন গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা'। এ কোনো অলীক-বাক্য নয়, নয় কোনো রূপক। বাস্তবেই গঙ্গাপূজারও অন্যতম উপাদান গঙ্গাজলই। সে কারণেই গঙ্গা সর্বোত্তমা, গঙ্গা ভারতের মূল জীবন প্রবাহ। গঙ্গার দুটি রূপ। বৈদিক নদী রূপে গঙ্গা ভারত সভ্যতা ও সংস্কৃতির একই সঙ্গে জননী ও রক্ষয়ত্রী। গঙ্গা সদানীরা। ভারতের অতি পবিত্র এই নদীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভারত-ইতিহাস, অতি নিবিড় ভাবে। গঙ্গা আবার দেবীও। মাতৃরূপা। দেবী রূপে তিনি কখনও হিমালয় দুহিতা, কখনও তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া আবার কখনও শিবজায়া। গঙ্গা-ই আবার ভীষ্ম জননী, ভগীরথ কন্যা হিসেবে ভাগীরথী। নদী এবং দেবী দুই রূপেই গঙ্গা হিন্দু জীবনের এক পরম বৈকুণ্ঠলোক। হিন্দুর সব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্যই তো প্রয়োজন পড়ে গঙ্গাজলের। গঙ্গাপ্রাপ্তি হিন্দুর এক অতি বাঞ্ছিত কামনা। দাহ অন্তে অস্থিভস্ম তাই বিসর্জন দেওয়া হয় গঙ্গায়। বিশ্বাস, এতেই হবে সব পাপস্খালন। লাভ হবে মোক্ষ। এ কারণেই হিন্দুর পার্থিব ও অপার্থিব জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে গঙ্গা, নদীরূপে--- দেবীরূপেও।

গঙ্গা দশহরা : গঙ্গা দশহরা। দশহরা তার বিশেষণ। দশ এখানে কেবল একটি সংখ্যা নয়। দশ অর্থে এখানে বোঝায় দশরকম বা দশবিধ। গঙ্গা মানুষের দশরকম পাপ হরণ করেন বলেই তাঁর এই নাম। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে পালন করা হয় এই দশহরা— গঙ্গা স্নানের মাধ্যমে।

পাপ মানুষের জন্মের দোসর। জন্মের পর থেকেই মানুষ পাপ করে যায়। এইসব পাপের কথা সব সময় মানুষ জানেও না, বোঝে না কেমন করে সে হচ্ছে পাপের ভাগী। জন্ম থেকেই পাপের সঙ্গে মানুষের বাস। ভোগ করতে হয় তার ফল।

এই পাপ তিন রকম— কায়িক, বাচিক ও মানসিক। এই পাপের ভার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যই মানুষ দশহরায় গঙ্গায় পুণ্যস্নান করে। সর্বপাপ হারিণী— গঙ্গায় স্নানের মধ্য দিয়ে মানুষ হতে চায় নির্মল— অকলঙ্ক। হতে চায় পবিত্র।

পাপ তার দশটি : মানুষের দশরকম পাপের মধ্যে তিনটি হলো কায়িক। কায়িক পাপ হলো অদত্ত বস্তু গ্রহণ অর্থাৎ চুরি, শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিষয়ে হিংসা এবং পরস্ত্রীতে আসক্তি ও তার সঙ্গে সহবাস। বাচিক চারটি পাপের মধ্যে পড়ে, পরুষ অর্থাৎ নিষ্ঠুর মর্মঘাতী, রুক্ষ্ম কথা, অসত্যভাষণ, পরনিন্দা, অসম্বন্ধ ও পরচর্চা, পরের দোষের কথা প্রকাশ করা অসংলগ্ন প্রলাপ।

মানসিক পাপের সংখ্যাও তিনটি। এগুলি হলো পরের জিনিসে হিংসা এবং তা নেওয়ার ইচ্ছা, অপরের অনিষ্ট বা ক্ষতি করার চেষ্টা এবং মিথ্যায় আসক্তি।

শুধুই অবগাহন? : জীমূতবাহন, বৃহস্পতি, রায়মুকুট, শ্রীনাথ আচার্যচূড়ামণি, রঘুনন্দন প্রমুখ স্মৃতিকাররা দশহরার দিনে গঙ্গাস্নানের মাহাত্ম্যের কথা বলেছেন, কিন্তু আলাদা করে গঙ্গাপূজার কোনো উল্লেখ করেননি। স্কন্দপুরাণে অবশ্য এই দিনে গঙ্গায় স্নান করে দশটি ফুল, দশটি ফল ও দশটি প্রদীপ দিয়ে গঙ্গার পূজা করার কথা বলা হয়েছে।

স্বর্গের নদী মর্ত্যে : শাস্ত্রীয় বিচারে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দশমীকে পুণ্যতিথি বলা হয়। আর সে কারণেই এটি হিন্দু-জীবনে পরম অর্থবহ। এই দিনটির সঙ্গে একই সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেবী গঙ্গার সৃষ্টি এবং মর্ত্যে গঙ্গা নদীর অবতরণের বিষয়টি। তাই দশহরার অন্য নাম গঙ্গাবতরণ তিথি। পৌরাণিক কাহিনি হলো, স্বর্গের নদী গঙ্গা সেই দিন মর্ত্যে অবতরণ করেছিলেন ভগীরথের পূর্বপুরুষ রাজা সগরের ৬০ হাজার পুত্রকে পাপমুক্ত করার জন্য। রাজা সগরের অশ্বমেধের ঘোড়াটি ইন্দ্র চুরি করে লুকিয়ে রাখেন মহাতপা কপিল মুনির আশ্রমে। সগর-সন্তানরা খুঁজতে খুঁজতে সন্ধান পান অপহৃত অশ্বের। মুনিকেই চোর ভেবে তারা বলে নানা কুকথা। আর সেই সময় কপিল মুনির দৃষ্টিপাতে ভস্ম হয় সগরের ষাট হাজার সন্তান।

পরে কপিল মুনি শান্ত হয়ে বলেন, স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে মর্ত্যে আনতে পরলে, সেই বারিরাশির স্পর্শে ছাই হয়ে যাওয়া ওই ষাট হাজার সন্তান কলুষমুক্ত হবে এবং মুক্তিও পাবে। স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে মর্ত্যে আনার জন্য এবার শুরু হয় তপস্যা। প্রথমে রাজা সগরের নাতি অংশুমান, তারপর তাঁর ছেলে দিলীপ দীর্ঘ তপস্যা করেন। কিন্তু ব্যর্থ হন তাঁরা। অবশেষে দিলীপপুত্র ভগীরথের তপস্যায় তুষ্ট হন গঙ্গা, অবতীর্ণ হন মর্ত্যে। গঙ্গার জলধারায় প্রাণ ফিরে পেয়ে মুক্তি পান সগর সন্তানরা।

গঙ্গার এই মর্ত্যে অবতরণের দিনটি ছিল জ্যৈষ্ঠের শুক্লা দশমী তিথি। আর সে কারণেই এই দিনে গঙ্গা নদীতে স্নান করলে মুক্ত হওয়া যায় এই জন্মের সঙ্গে দশ জন্মের সব পাপ থেকে।

গঙ্গা বহুনামা : গঙ্গার মর্ত্যে অবতরণ ঘটান রাজা ভগীরথ। সে কারণে গঙ্গাকে বলা হয় তাঁর কন্যা। মর্ত্যে এক নাম হয় ভাগীরথী। গঙ্গার কিন্তু ওই একটি নাম নয়। স্বর্গ থেকে মর্ত্যে অবতরণ এবং হিমালয় থেকে সাগর পর্যন্ত বয়ে চলার পথে ঘটে আরও নানা ঘটনা। এবং সেইসব ঘটনার সূত্রেই গঙ্গারও হয় নানা নাম।

যেমন, অবতরণের শুরুতেই বিপত্তি। স্বর্গ থেকে নেমে আসা গঙ্গার বেগ ধারণের জন্য রাজি করানো হয়েছিল দেবাদিদেব মহাদেবকে। স্বর্গ থেকে তাঁরই মাথায় এসে

পড়ে গঙ্গা। কিন্তু চপলতা বশে শিবকেই জলতরঙ্গে নিমজ্জিত করার চেষ্টা করলে শিব তাঁর জটায় আবদ্ধ করেন গঙ্গাকে। পরে ভগীরথের তপস্যায় তুষ্ট মহাদেব গঙ্গাকে মুক্ত করেন বিন্দুসরোবরে। শিবের জটায় থাকার কারণে গঙ্গা হন শিবজায়া।

সমতলের পথে জহ্নুমুনির আশ্রম। আবার চলল গঙ্গা। প্লাবিত করতে চান আশ্রম। ক্রুদ্ধ মুনি গণ্ডুষ পান করেন গঙ্গাকে। আবার ভগীরথের কাকুতি মিনতি। শান্ত হন মুনি। কান দিয়ে বের করে দেন গঙ্গাকে। তাই তার নাম জাহ্নবী। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল এই ত্রিলোকেই প্রবাহিত হয় গঙ্গা। তাই তার আরেক নাম ত্রিপথগা।

পুরাণে উদ্ভব কথা :

গঙ্গার উদ্ভব নিয়েও পৌরাণিক কাহিনির শেষ নেই। রামায়ণে আছে, হিমালয় ও মেরু-দুহিতা মেনকার বড়ো মেয়ে গঙ্গা আর ছোটো মেয়ে উমা। দেবতারা তাঁদের প্রয়োজনে গঙ্গাকে স্বর্গে নিয়ে যেতে চান। হিমলয়ও 'ত্রৈলোক্যহিত কাম্যয়' দিয়ে দেন গঙ্গাকে। স্বর্গে তিনি হন সুরগঙ্গা।

অন্য কাহিনি, ব্রহ্মার কমণ্ডলু হঠাৎই এক নারী মূর্তির রূপ নেয়। সেই মূর্তিই গঙ্গা। আবার ব্রহ্মা তাঁর কমণ্ডলুতে বিষ্ণুর পা ধোওয়া যে জল রাখেন সেটাই গঙ্গা। নাম হয় তার বিষ্ণুপদী।

দেবী ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে, কথা রাসপূর্ণিমায় মহাদেবের গান শুনে গলে যান রাধা-কৃষ্ণ। সেই জলই গঙ্গা। ব্রহ্মবৈবর্তে আরও আছে, গঙ্গা কৃষ্ণে অনুরক্তা হলে ক্রুদ্ধ রাধা তাঁকে মারতে যান। ভয়ে কৃষ্ণচরণে আশ্রয় নেন গঙ্গা। পৃথিবী হয় নির্জলা। সে সময় দেবতাদের অনুরোধে নিজের পায়ের আঙুলের নখ থেকে গঙ্গাকে মুক্ত করেন। সে কারণেই গঙ্গার নাম হয় বিষ্ণুপদী।

গায়ক হিসেবে অতিগর্বী নারদকে শিক্ষা দিতে রাগরাগিনীরা বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে থাকে। নারদকে জানায় তাঁর ভুল গাওয়ার ফলেই তাদের এই অবস্থা। এখন মহাদেব গান গাইলেই সুস্থ হয় তারা। নারদের কথায় গান শোনান মহাদেব। শ্রোতা ছিলেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু। ব্রহ্মা সে গানের কিছুই বুঝতে পারেন না। বিষ্ণু যেটুকু বুঝেছিলেন, তাতেই দ্রবীভূত হন তিনি। ব্রহ্মা সঙ্গে সঙ্গে নিজের কমণ্ডলুতে ভরে নেন দ্রবীভূত বিষ্ণুকে। সেই পবিত্র বারিই গঙ্গা।

স্কন্দ পুরাণে আছে, গঙ্গা হলেন শিব-পার্বতীর ছেলে কার্তিকের পালিকা মা। আবার অন্য এক পুরাণে বলা হয়েছে, মাতা পার্বতী একদিন তাঁর দেহমন দিয়ে গণেশমূর্তি তৈরি করে সেটিকে গঙ্গা জলে ডুবিয়ে স্নান করান। স্নান করানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই মূর্তিতে আসে প্রাণ। আর এই কারণেই গণেশের অন্য নাম দ্বৈমাতুর ব গাঙ্গেয়। অর্থাৎ তাঁর দুই মা— পার্বতী এবং গঙ্গা।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে, বিষ্ণুর তিন স্ত্রী— লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা। তিন সতিনে ঝগড়া লেগেই থাকত। তিনি বিরক্ত হয়ে বিষ্ণু তুলনায় শান্ত লক্ষ্মীকে নিজের কাছে রেখে শিবকে গঙ্গা এবং ব্রহ্মাকে দিয়ে দেন সরস্বতীকে।

ব্রহ্মবৈবর্তরই আরেক কাহিনি, তিন স্ত্রীর মধ্যে গঙ্গার প্রতি বেশি অনুরক্ত হন বিষ্ণু। আর তাতেই রেগে গিয়ে গঙ্গাকে মারতে থাকেন সরস্বতী। লক্ষ্মী থামাতে এলে সরস্বতী এবার লক্ষ্মীকে নরলোকে জন্মাবার অভিশাপ দেন। এতে রেগে গিয়ে সরস্বতীকে পৃথিবীতে নদী হবার অভিশাপ দেন গঙ্গা। পালটা সরস্বতীও দেন একই অভিশাপ। পারস্পরিক এই অভিসম্পাতের ফলেই সরস্বতী, গঙ্গা ও লক্ষ্মী ও পদ্মাবতী নদী হিসেবে বইতে থাকে। বিষ্ণু অবশ্য বলেন, মর্ত্যে গঙ্গার সঙ্গে বিয়ে হলো রাজা শান্তনুর। তারপরে কৈলাশে ফিরে গিয়ে গঙ্গা হয়তো শিবের স্ত্রী। আর সরস্বতীও একইভাবে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার স্ত্রী হয়ে বাস করবেন।

এইসব কাহিনির মধ্য দিয়ে জানা যায় সর্বপাপ-হারিণী গঙ্গার পবিত্রতার কথা। জানা যায় সেই বৈদিক যুগেও গঙ্গার প্রতি বিনম্র ছিল সকলে। ঋগ্বেদের তৃতীয়, ষষ্ঠ ও দশম মণ্ডলে আছে গঙ্গার কথা। গঙ্গার স্তুতি করেছেন সিন্ধুজিৎ ঋষি (১০।৭৫।৫)। বৃহস্পতির পুত্র ঋষি শংযু বলেছেন গঙ্গার উন্নতকুলের কথা (৬।৪৫।৩১)। বিশ্বামিত্র বলেছেন, 'হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদের আদিভূমি, তোমাদের পবিত্র সঙ্গী ধনসম্পদ সবই ওই জাহ্নবী তীরে (৩।৫৮।৬)।

মহাভারতেও পুলস্ত্য ভীষ্মকে বলেন, 'যেখানে গঙ্গা আছে সেটাই দেশ, গঙ্গাতীরের সে দেশই তপোবন ও স্নিগ্ধতীর্থ।' মহাভরতের বনপর্বেও (৭০।৯০) গঙ্গাকে কলিযুগের শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলা হয়েছে।

অপরূপা : গঙ্গা অপরূপা। পদ্মপুরাণের বর্ণনা, গঙ্গা দ্বিভুজা, শুভ্রবর্ণা ও মকরবাহনা। অগ্নিপুরাণেও আছে একই কথা। স্কন্দপুরাণে অবশ্য তিনি চতুর্ভুজা, চন্দ্রসৌম্যা বর্ণের। বৃহৎ ধর্মপুরাণেও তাই। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মতে তাঁর বর্ণ শ্বেতচম্পকের মতো। গঙ্গার ধ্যান-মন্ত্রেও তিনি শুক্লবর্ণ, নানা অলংকারভূষিতা, চতুর্ভুজা, প্রসন্নবদনা এবং ভক্তি মুক্তি প্রদায়িণী।

অবগাহন স্নানই প্রধান

দশহরায় গঙ্গা বা নদীতে স্নানই মুখ্য কর্ম। তবে প্রতিমা পূজার কথা আছে পুরাণে। সোনা বা অন্য ধাতু, দারু বা মাটির প্রতিমা তৈরি করে ততে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে পূজা করার কথা আছে কালিকা পুরাণে। এখন অবশ্য প্রতিমা গড়ে গঙ্গাপূজা একবারেই বিরল।

খ্রিস্টানদের স্বীকারোক্তি :

দশহরার পাপ মুক্তির অনুষ্ঠানের মতোই খ্রিস্টানদের স্বীকারোক্তি বা কনফেশনের মিল খুঁজে পান অনেকে। অপহরণ, হত্যা, অজাচার, ডাকাতি, ব্যাভিচার, ধর্ষণ, গর্ভপাত ইত্যাদি এবং অজ্ঞানতাজনিত পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য খ্রিস্টানরা গির্জায় গোপনে যাজকের কাছে নিজের অপরাধ বা পাপের কথা বলেন। বিশ্বাস, এতেই হয় অপরাধ বা পাপের স্খালন। অনুমান, খ্রিস্টানদের এই স্বীকারোক্তির রীতিটি অন্য ধর্ম থেকে নেওয়া।

দশহরায় মনসাপূজা : দশহরার দিন কিন্তু মনসা পূজারও প্রচলন রয়েছে বঙ্গদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে। বর্ষার মুখে সাপের উৎপাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই মনসা পূজা করা হয় দশহরার দিনে। সবমিলিয়ে হিন্দুর ধর্মীয় জীবনের এক উল্লেখযোগ্য কৃত্য দশহরা। সারল্য, উদারতা, অনড়ম্বর জীবনচর্যা এবং নৈতিক মূল্যবোধের এক রত্নদ্যুতি ছড়ানো অনুষ্ঠান— এই দশহরা।

(দশহরা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

শিবাজীর রাজ্যাভিষেক তিথি হিন্দু সাম্রাজ্য দিনোৎসব

মন্দার গোস্বামী

জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি ভারতীয় ইতিহাসের এক গৌরবময় দিন। এই তিথিতেই রায়গড়ে পণ্ডিত গাগা ভট্টের পৌরোহিত্যে মহাসমারোহে শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়। ইতিহাসের কালখণ্ডে শিবাজী মহারাজের আবির্ভাব এমন এক সময়ে যখন মুঘল অপশাসনে, বিশেষত ঔরঙ্গজেবের নৃশংস অত্যাচারে হিন্দু সমাজ প্রবলভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত, অসহায় ও বিপর্যস্ত। ভারতীয় ইতিহাসের সে এক করুণ অধ্যায়, যখন অপমানজনক জিজিয়া কর অথবা স্বধর্ম ত্যাগ এই দুইটির মধ্যে একটিকে বেছে নিয়ে হিন্দু সমাজকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। চলছে ব্যাপকহারে মন্দির ধ্বংস, এমনকী রাজপুত রাজগণও মুঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করে আপন কন্যা সম্প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের ধন্য বলে মনে করছেন। এমনই এক অস্থির, সংকটময় সময়ে, হতাশাগ্রস্ত সন্ত্রস্ত অসংগঠিত হিন্দু সমাজকে সুসংগঠিত করে রাষ্ট্রীয় স্বাভিমান জাগিয়ে শিবাজী স্থাপন করলেন হিন্দু সাম্রাজ্য, যা তার মৃত্যুর পরও শতবর্ষ স্থায়ী হয়েছিল।

ভারতীয় ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে ভারতবর্ষই বিশ্বের একমাত্র দেশ, যে বারবার বিদেশি আক্রমণকারী দ্বারা আক্রান্ত, লুণ্ঠিত ও শাসিত হয়েছে। আর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শিবাজীর বহু বহুপূর্বে একাধিক রাজা যেমন চন্দ্রগুপ্ত, অশোক প্রমুখ ভারতবর্ষের বৃহৎ অংশ ঐক্যবদ্ধ করে, ভারতীয় সাম্রাজ্য বালুচিস্তান আফগানিস্তান (তৎকালীন গান্ধার) পর্যন্ত প্রসারিত করে গিয়েছিলেন। কিন্তু গোল বাঁধলো পাঠান, মুঘলদের নিয়ে। তারা ভারতের বাইরে থেকে এল, আর এসেই ভারতীয়দেরই ওপর নৃশংস অত্যাচার শুরু করল। ধ্বংস হতে থাকল সনাতন হিন্দু সভ্যতার শ্রদ্ধা কেন্দ্রগুলি। একের পর এক ভস্মীভূত হলো দুর্মূল্য পুস্তক সমৃদ্ধ অসংখ্য গ্রন্থাগার। পাশাপাশি তারা জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল তাদের জীবন পদ্ধতিকে। ক্রমে ক্রমে তারা ভারতবর্ষকে খণ্ড খণ্ড করে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ বুঝে নিল।

আর এখানেই শিবাজী মহারাজের অসামান্য কৃতিত্ব। একধারে বিজাপুর, অপরদিকে গোলকুণ্ডা, সর্বোপরি মহাশক্তিশালী নৃশংস মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব, চতুর্দিকে ইসলামিক শাসন পরিবেষ্টিত।

এই প্রবল বিপরীত পরিস্থিতিতেও শিবাজী তাঁর অসামান্য সমর দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা আর সাহসের মাধ্যমে, অসংগঠিত, হিন্দু সমাজকে সুসংগঠিত করে, নিজ ভূমি পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে স্থাপন করলেন হিন্দু সাম্রাজ্যের। সমাজে অবহেলিত মাওয়ালিদের মধ্যে সঞ্চারিত করলেন স্বাধীনতার বীজমন্ত্র। নিজস্ব সেনাবাহিনী, অষ্টপ্রধান মন্ত্রীপরিষদ, নিজস্ব নৌবহর, ব্যবস্থিত আইন, সুবিন্যস্ত কর ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রকৃত অর্থেই প্রবল প্রতাপশালী মুঘল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে স্বাধীন, স্বাভিমানী হিন্দু রাষ্ট্রের পুনর্জন্ম ঘটল। আশ্চর্য হতে হয়, মূলত ইসলামিক শাসন থেকে পুনরুদ্ধার করে হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপন করলেও শিবাজী মহারাজ কখনোই ধর্মান্ধ ছিলেন না। মাতা জিজাবাঈয়ের মাধ্যমে সংস্কারিত, মাতৃভক্ত শিবাজী নারী জাতির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। দাদাজী কোণ্ডদেবের শিক্ষায় শিক্ষিত, সনাতন আদর্শে দীক্ষিত, সমর্থ গুরু রামদাসের শিষ্য শিবাজী কখনোই পরধর্মে আঘাত হানেননি। মুসলমান নারী, শিশুর প্রতি আশ্চর্য উদারতা দেখিয়েছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে কোরান কুড়িয়ে পেলে ধর্মপ্রাণ মুসলানকে তা অর্পণ করেছেন। এক বার এক দলপতি যুদ্ধে সংগৃহীত অসামান্য রূপসী এক মুসলমান মহিলাকে উপহার হিসেবে শিবাজীর সামনে উপস্থিত করলে শিবাজী তাকে মা সম্বোধন করে, ক্ষমা চেয়ে, সসম্মানে ফেরত পাঠিয়ে দেন। হিন্দু বিদ্বেষী কাফি খানকেও শিবাজীর এই মহানুভবতা স্বীকার করতে হয়েছে।

উদার, মহানুভব, পরধর্ম সহিষ্ণু, ধর্মমত নির্বিশেষে প্রজা কল্যাণকারী সাম্রাজ্যের স্থপতি হওয়া সত্ত্বেও একশ্রেণীর ঐতিহাসিক নাগাড়ে শিবাজীকে দস্যু নেতা হিসেবে অভিহিত করেছেন। বিদেশি ভিন্সেন্ট স্মিথ প্রমুখ তো বটেই এদেশেরও একশ্রেণীর চাটুকার তথাকথিত ঐতিহাসিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে শিবাজী মহারাজকে কালিমালিপ্ত করার অপচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। স্যার যদুনাথ সরকারই প্রথম অক্লান্ত গবেষণা করে, মহান শিবাজীকে বিশ্বের দরবারে সসম্মানে উপস্থাপন করলেন। তুলনা করে দেখালেন, শিবাজী যদি লুটেরা হন তাহলে নেপোলিয়নও লুটেরা ছিলেন। আজও ভিয়েতনামে গেরিলা যুদ্ধের স্রষ্টা হিসেবে শিবাজীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী, বালগঙ্গাধর তিলক, ভগিনী নিবেদিত প্রমুখ সকলেই শিবাজীর মহান জীবন থেকে প্রেরণা লাভ করেছিলেন। রাষ্ট্রীয় স্বাভিমান নির্মাণে বালগঙ্গাধর তিলক প্রচলন করেছিলেন 'শিবাজী উৎসব'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, 'শিবাজী উৎসব' কবিতা, যেখানে কবিগুরু শিবাজীর সংকল্প ব্যক্ত করলেন এই ভাবে 'এক ধর্মরাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দেব আমি'।

বীর শিবাজীর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, তিনি নিজ বুদ্ধিবল, সাংগঠনিক শক্তি, সমর দক্ষতার মাধ্যমে স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজ্যের নির্মাণ করলেও সেই রাষ্ট্র কিন্তু এক লহমায় গুরু রামদাসকে অর্পণ করে, নিজে ভিক্ষাবৃত্তি বেছে নিয়েছিলেন। যদিও গুরুনির্দেশে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে সাম্রাজ্য সুনামের সঙ্গে শাসন করেন। মাত্র ৫০ বা ৫২ বছরে মৃত্যু না হলে ভারতের ইতিহাস হয়তো অন্যরকম হতো। তাঁর শাসন নীতি আজও সমান প্রাসঙ্গিক। যদি তার নীতিসমূহকে সময়োপযোগী অনুকরণের মাধ্যমে, পূর্ণ উৎসাহের সঙ্গে সমাজ জীবনে প্রয়োগ করা যায়, তবে ভারতবর্ষ অবশ্যই শ্রেষ্ঠত্বের দিকে এগিয়ে যাবে।

(হিন্দু সাম্রাজ্যদিনোৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

বিশেষ ঘোষণা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাজ বাঙ্গলায় গত ১৯৩৯ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছে। সেই কাজে বাঙ্গলা তথা ভারতের বহু কার্যকর্তা ও প্রচারকের পরিশ্রম নিহিত আছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রয়াত, অনেকে খুবই বৃদ্ধ। তাই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বাঙ্গলার সঙ্ঘকাজের প্রারম্ভিক ইতিহাস তুলে ধরা প্রয়োজন। এই কাজ স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট হাতে নিয়েছে। আগামী শুভ জন্মাষ্টমী, ২০২২ তিথিতে '**বাঙ্গলায় সঙ্ঘের কাজের ইতিহাস**' নামক এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হতে চলেছে। সহযোগ রাশি ২৫০্ টাকা। প্রকাশপূর্ব রাশি ১৫০্ টাকা।

প্রকাশ পূর্ব রাশি দেওয়ার শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, ২০২২। জেলা অনুসারে অথবা ব্যক্তিগত ভাবে টাকা পাঠাতে পারেন। সরাসরি টাকা ব্যাংকে পাঠানোর জন্য নীচে ব্যাংকের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো। টাকা ব্যাংকে পাঠানোর পর তপন সাহা (মো: ৯৯০৩০০২৯০১) অথবা মহেন্দ্র নারায়ণ দাস (মো : ৯৪৭৭৩৯৯২৯৭)— এই দু'জনের কাউকে অবশ্যই জানাবেন।

বইটি কীভাবে সংগ্রহ করবেন তা লিখে জানাবেন। ডাকযোগে নিতে হলে ডাকমাশুল আলাদা ভাবে পাঠাবেন।

Account Name : **SWASTIK PRAKASHAN TRUST**
A/C. No. : **0954000100121397**
IFS Code : **PUNB0095400**
Bank Name : **PUNJAB NATIONAL BANK**
VIVEKANAND ROAD
Kolkata - 700 006

মিসিং লিংক

যুদ্ধে হারের লজ্জায় আত্মহত্যা করলেন জয়পালদেব

সন্দীপ চক্রবর্তী

হিন্দু রাজাদের আত্মসম্মানবোধ ছিল অন্য রকমের। রাজা শুধুমাত্র রাজনৈতিক ব্যক্তি নন, তিনি দেশ, সমাজ ও মানুষের রক্ষক। ভারতবর্ষের প্রাচীন শাস্ত্রে রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলা হয়েছে। সুতরাং রাজা যদি বহিরাগত বিধর্মীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হন তাহলে সেই পরাজয় একজন রাজার ব্যক্তিগত পরিসরে আবদ্ধ না থেকে হয়ে ওঠে স্বয়ং ঈশ্বরের পরাজয়। পরাস্ত রাজার পক্ষে এই মর্মপীড়া সহ্য করা সেইসময় খুব সহজ কাজ ছিল না। সম্ভবত সেই কারণেই সুলতান মামুদের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে জয়পালদেব আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিলেন।

একটা কথা এখানে স্বীকার করতেই হবে, আত্মহত্যা যে কারণেই করা হোক, এটি একটি নেতিবাচক ঘটনা। কিন্তু সুলতান মামুদের বিরুদ্ধে ভারতীয় হিন্দু রাজাদের সংগ্রাম সামগ্রিক ভাবে নেতিবাচক নয়। ১০০১ খ্রিস্টাব্দে পেশোয়ারের কাছাকাছি উদভাণ্ডপুরে ছিল শাহি সাম্রাজ্যের শাসন। এই শাহি সাম্রাজ্যের রাজারা 'পাল' পদবি ব্যবহার করতেন। কেউ কেউ মনে করেন এরা গৌড়ীয় পালবংশের লোক, আবার অনেকে আছেন যারা এই যুক্তি মানতে চান না। যাইহোক, ১০০১ খ্রিস্টাব্দে মামুদ উদভাণ্ডপুর আক্রমণ করে। সেইসময় শাহি বংশের কর্ণধার জয়পালদেব। মামুদ যখন দরজার কাছে পৌঁছে গেছে, জয়পালদেব উপলব্ধি করলেন এই আক্রমণ ঠেকানোর জন্য তাঁর সেনাবাহিনী ঠিকমতো প্রস্তুত নয়। এটা তখনকার আমলে রুটিন ব্যাপার। হঠাৎ আক্রান্ত হলে কীভাবে তা মোকাবিলা করা হবে সে ব্যাপারে অধিকাংশ হিন্দু রাজাই ভাবনাচিন্তা করতেন না। তাই জোড়াতালি দেওয়া বাহিনী নিয়ে যুদ্ধে গেলেন জয়পালদেব। ফল যা হবার তাই হলো। তিনি পরাস্ত ও বন্দি হলেন। এরপরের ঘটনা মারাত্মক। পঞ্চাশটি হাতির বিনিময়ে মামুদ জয়পালদেবকে মুক্তি দিতে রাজি হন। এই ঘটনায় মর্মান্তিক আঘাত পান জয়পালদেব এবং আত্মহত্যার পথ বেছে নেন।

এখানে একটা কথা না বললেই নয়। ভারতবর্ষের হিন্দু রাজারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকলেও তাদের যুদ্ধ সম্পূর্ণ মানবিকতা-বর্জিত ছিল না। তারা একটা যুদ্ধনীতি মেনে চলতেন। এই যুদ্ধনীতি অনেকাংশেই মহাভারতের কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধনীতির অনুরূপ। অর্থাৎ, যুদ্ধ হবে শুধু দিনের বেলায়, শরণাগত শত্রুসৈন্যকে আঘাত করা যাবে না, যুদ্ধে অনিচ্ছুক বা পলায়নপর শত্রুসৈন্যকে আঘাত করা যাবে না ইত্যাদি। এছাড়া, যুদ্ধ যেহেতু হিন্দু রাজাদের মধ্যে, তাই দু'পক্ষের যোদ্ধারা হতেন একই সংস্কৃতি ও একই উপাসনা পদ্ধতির লোক। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভাষাও হতো এক। গৌড়ের সঙ্গে কামরূপের বা কাশীর সঙ্গে কোশলের মধ্যে কতটাই-বা সাংস্কৃতিক পার্থক্য থাকতে পারে? সেইজন্য যুদ্ধের ফলাফল নির্ভর করত শুধুমাত্র সামরিক দক্ষতা ও কৌশলের ওপর। যোদ্ধাদের বাড়তি নৃশংসতা বা বিশেষ কোনও অ্যাটিটিউডের দরকার পড়ত না। কিন্তু মামুদ ও তার যোদ্ধারা মুসলমান। তারা কোনও যুদ্ধনীতি মানে না। ভারতীয় হিন্দু রাজাদের যুদ্ধে হারিয়ে এখানকার রাজা হয়ে বসা তার উদ্দেশ্য নয়, সে চায় লুটপাট করতে এবং 'কাফের' রাজাকে হত্যা করে অথবা মুসলমান বানিয়ে এখানকার ধর্ম ও

সংস্কৃতি ধ্বংস করতে। সে এখানকার মানুষের মনে এমন এক চিরস্থায়ী ভয় ধরিয়ে দিতে চায় যাতে হিন্দুরা আর কোনওদিনই মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। এর জন্য শুধু যুদ্ধে জিতলে চলে না, নিষ্ঠুরতার সমস্ত সীমা পার করে জিততে হয়। বলাবাহুল্য, এরকম একজন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে যে অ্যাটিটিউড দরকার, তা বেশিরভাগ হিন্দু রাজারই ছিল না।

কিন্তু তাই বলে কোনও হিন্দু রাজা চেষ্টা করেননি, ব্যাপারটা এরকমও ছিল না। মুসলমান ঐতিহাসিক ফিরিস্তা এক সামরিক জোটের কথা লিখেছেন। এই জোট হয়েছিল ১০০৮ সালে, মামুদকে আটকানোর জন্য। জোটে ছিলেন উজ্জয়িনী, গোয়ালির, কালীনগর, কনৌজ ও আজমেরের রাজারা। যুদ্ধ হয়েছিল চল্লিশদিন ধরে। ফিরিস্তা লিখেছেন, স্থানীয় মেয়েরা গয়না খুলে দিয়েছিলেন সাহায্য করার জন্য। মামুদের নির্দেশে ৫০০০ তিরন্দাজ হিন্দুদের আক্রমণ করে। কিন্তু তাতে কাজের কাজ হয়নি। হিন্দু সৈন্যরা মামুদের লাইন অব কন্ট্রোল ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করেন। আর এক ঐতিহাসিক উটবি স্বীকার করেছেন প্রচণ্ড আক্রমণে মামুদ প্রায় হারতে বসেছিল। কিন্তু মামুদের সেনারা হিন্দুদের হস্তীবাহিনীকে আক্রমণ করে। কারণ হাতির পিঠে চেপেই যুদ্ধ করছিলেন সামরিক জোটের অন্যতম প্রধান শাহি সাম্রাজ্যের আনন্দপাল। তির ও বর্শার ঝাঁক দেখে যেই আনন্দপালের হাতি পালাতে শুরু করল, হিন্দু সৈন্যরা ভাবল, রাজা নিশ্চয়ই মারা গেছেন। পালাতে শুরু করল তারাও। হেরে গেল সামরিক জোট।

এই পরাজয়ের পর শাহি সাম্রাজ্যের রাজধানী ননদানায় স্থানান্তরিত হলো। তারা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন মামুদকে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়বেন না। ১০১৩ সালে আবার ভারত আক্রমণ করল মামুদ। এবার তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন শাহি সাম্রাজ্যের আর এক রত্ন ত্রিলোচনপালদেব। কলহন তাঁর রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে লিখেছেন, কাশ্মীরের প্রধনমন্ত্রী এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উটবি লিখেছেন, দীর্ঘদিন ধরে এই যুদ্ধে চলেছিল। যতদিন পাহাড়ে যুদ্ধ হয়েছে ততদিন হিন্দুদের পাল্লা ভারী ছিল কিন্তু সমতলে যুদ্ধ শুরু হবার পরই মামুদের সেনা ভয়ংকর হয়ে ওঠে। কলহন লিখেছেন, যুদ্ধে জেতার পরেও মামুদের সেনাপতি হামিরা ঠিকমতো নিঃশ্বাস নিতে পারছিল না। তখনও ত্রিলোচনপালদেবের অসামান্য বীরত্বের স্মৃতি তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এরপর শাহি সাম্রজ্যের রাজারা লোহারায় (অধুনা লোখট) তাদের সামরিক ঘাঁটি তৈরি করে। ১০১৫ সালে মামুদ এই ঘাঁটি আক্রমণ করে। ফিরিস্তা লিখেছেন, এই যুদ্ধে মামুদ সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়। বারাণসীর মতো এখান থেকেও তাকে চোরের মতো পালাতে হয়। যতদিন শাহি সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল ততদিন লোহারা দখল করতে পারেনি মামুদ।

শাহি সাম্রাজ্য ছাড়া চান্দেলারা মামুদকে যথেষ্ট বেগ দিয়েছিল। মামুদের সময়ে চান্দেলা সাম্রাজ্যের রাজা ছিলেন বিদ্যাধর। ত্রিলোচনপালদেবের ছেলে আরও কয়েকজন রাজকে নিয়ে বিদ্যাধরের সঙ্গে যোগ দেন মামুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন বলে। ১০১৮ সলে ভারত আক্রমণ করে মামুদ। চান্দেলা রাজসভায় দূত পাঠিয়ে জানায়, বিদ্যাধর যদি ইসলাম কবুল করেন তাহলে তাঁর কোনও সমস্যা হবে না। কিন্তু বিদ্যাধর স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তিনি যা বলার যুদ্ধক্ষেত্রে বলবেন। মধ্যযুগের ঐতিহাসিক নিজামুদ্দিন আহমেদের লেখায় পাচ্ছি, মামুদ বেশ তাচ্ছিল্যভরেই গিয়েছিলেন হিন্দুদের শক্তি যাচাই করতে। কিন্তু হিন্দুদের বিশাল বাহিনী দেখে মামুদ হতাশ হয়ে পড়ে। নিজামুদ্দিন লিখেছেন, অনুশোচনায় জর্জরিত মামুদ মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আল্লাহের কাছে প্রার্থনা করে তাকে কোনওভাবে জিতিয়ে দেবার জন্য। তবে মামুদের ভাগ্য ভালো হিন্দুরা তাকে তখনই আক্রমণ করেনি। তারা সময় নিচ্ছিল। সেই সুযোগি ধূর্ত মামুদ পালিয়ে যায়। পিছু ধাওয়া করলে মামুদকে সহজেই ‘ধরে ফেলা যেত। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া শত্রুর পিছু ধাওয়া করে তাকে হত্যা করা হিন্দু যুদ্ধনীতির বিরোধী। এরপর চান্দেলাদের সামরিক জোট ভেঙে যায়। ১০২২ সালে মামুদ চান্দেলা রাজ্য আক্রমণ করে। কিন্তু নিরাশ হয়েই ফিরতে হয় মামুদকে। কালাঞ্জরের যুদ্ধেও একই পরিণতি। নিজেদের মধ্যে উপহার সামগ্রী বিনিময় করে মামুদকে ফিরে যেতে হয়। এরপর মামুদ আর চান্দেলাদের আক্রমণ করেনি। শেষ দুটি যুদ্ধের বিবরণ মুসলমান ঐতিহাসিকেরা খোলসা করে দেননি। কাফেরের হাতে মুসলমান মার খেলে সচরাচর তারা নীরবই থাকেন।

সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলের রাজারা মামুদের বিরুদ্ধে যথেষ্টই লড়াই করেছিলেন। অনেক ক্ষেত্রেই সময়োপযোগী যুদ্ধনীতি ও সামরিক কৌশলের অভাবে তাদের হার স্বীকার করতে হয়েছে ঠিকই কিন্তু তার জন্য তাদের বীরত্ব বা জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টাকে অবহেলা করা যায় না।

মামুদের পর তার বংশের অনেকেই ভারত আক্রমণ করেছিল। অন্য কোনও নিবন্ধে সে কথা আলোচনা করা যাবে। তবে একটা সংঘর্ষের কথা না বললেই নয়। তখন আজমেড়ে চৌহান বংশের রাজত্বকাল। শাসন ক্ষমতায় রয়েছেন অরনোরাজা (১১৩৩-১১৫১)। তিনি বহিরাগত মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। অসংখ্য মুসলমান সেনা সেই যুদ্ধে প্রাণ হারায়। মৃতদেহগুলো রাস্তার ওপর ইতস্তত পড়েছিল। স্থানীয় গ্রামের লোকেরা পুড়িয়ে দেয়। আজমেড় জাদুঘরে রয়েছে চৌহান প্রশস্তী। তার বর্ণনা অনুযায়ী : সেবার যুদ্ধের পর গ্রামের রাস্তা তুর্কিদের রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল। এতটাই লাল যে সবাই ভেবেছিল লাল জামা পরে শুয়ে আছে রাস্তাটা। □

With Best Compliments from -

A
Well wisher

পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা কি ঘুমিয়েই থাকবে?

মণীন্দ্রনাথ সাহা

কিছুদিন আগে মালদহ জেলার কালিয়াচক থানার দুজন হিন্দুকে অপহরণ করে তাদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। তাদের পরিবারের লোকেরা কয়েকদিন আগে কালিয়াচক থানায় এ বিষয়ে অভিযোগ জানাতে গেলে থানার আইসি তাদের অভিযোগ গ্রহণে না করে পরিবারের সকলকে মুসলমান হয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু তাঁর পরামর্শ হিন্দু পরিবারদুটি উপেক্ষা করেন এবং অভিযোগ গ্রহণের অনুরোধ করেন। তবুও আইসি তাদের অভিযোগ গ্রহণ করেননি এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য প্রচণ্ড চাপ ও হুমকি দিতে থাকেন। হিন্দু পরিবার দুটি নিরুপায় হয়ে কলকাতা হইকোর্টের দ্বারস্থ হয় এবং মালদা শহরে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তির পাদদেশে অবস্থান করে। সেখানে তাঁরা বিভিন্ন বিবরণ দিয়ে পোস্টার সেঁটে দেন। সেই সমস্ত পোস্টারে লেখা রয়েছে— 'কালিয়াচক থানার আইসি আমাদের মুসলমান হতে বলছে এবং বিভিন্ন ভাবে চাপ দিচ্ছে, যাতে আমরা মুসলমান হই। আমরা আমাদের ধর্ম পরিবর্তন করতে চাই না।' 'ডিএসপি আমাদের বাড়ি গিয়েছিলেন, তিনি বলেন তোমার স্বামীকে ফেরত দেওয়া যাবে না।' 'হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও গীতার প্রতি কুৎসা রটানোকারী, অবমাননাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি চাই।' 'ধর্মান্তরিত দুই ভাইকে দিয়ে মুসলমানেরা হিন্দু ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থের কুৎসা রটিয়ে ভিডিয়ো ভাইরাল করছে যা আমাদের হিন্দু ধর্মের প্রতি খুবই অপমানজনক এবং লজ্জাজনক বটে। আমরা এগুলির সুবিচার চাই।' এছাড়া আরও পোস্টার রয়েছে। হাইকোর্ট আবেদনপত্র গ্রহণ করে ঘটনার সিবিআই এবং এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

> "হিন্দু ভাগের অংশে যারা শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তাঁরা উদ্ভট তত্ত্ব সামনে এনে এদেশের মুসলমানরা যেন আরও শক্তিশালী হয় এবং জনবিস্ফোরণ ঘটিয়ে পুনরায় এই অংশটিকে ভাগ করতে পারে সেই ব্যবস্থা করে গেছেন।"

মানুষ আশা করছেন, অভিযুক্ত কালিয়াচক থানার আইসিকে আদালত কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি দেবেন যাতে ভবিষ্যতে আর কোনো সরকারি অধিকারিক এ ধরনের কাজে উৎসাহ দেওয়ার সাহস না পায়। এই ঘটনার পর স্বভাবতই প্রশ্ন

উঠেছে— পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা কি নিরাপদ? এক কথায় বলা যায়, না! নিরাপদ নয়। কেননা এই লেখা পর্যন্ত আইসি-কে বরখাস্ত বা সাসপেন্ড করা হয়নি। যে রাজ্যের সরকারের নিজস্ব কর্মী তথা থানার সর্বোচ্চ আধিকারিক হয়ে শরণাপন্নকে তাঁর ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণের জন্য চাপ দিতে থাকে তখন সেই রাজ্যের হিন্দুদের ভবিষ্যৎ কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তা ভেবে আতঙ্কিত হতে হয় বই কী। আইসি এতবড়ো সাহস পেলেন কোথা থেকে? এ প্রসঙ্গে অনেকেই বলছেন— স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী যখন মাদ্রাসার সাহসী ছেলেদের হিন্দুদের শায়েস্তা করতে উৎসাহ করেন তখন আইসি যে হিন্দুদেরকে ধর্মান্তরিত হতে চাপ দেবেন তাতে দোষের কী আছে! উপরন্তু আইসি নিজেও জানেন, এ রাজ্যে হিন্দুদের ওপর শত অত্যাচার, নির্যাতন, হত্যা করলেও সরকার তাকে শাস্তি দেবে না। কেননা সরকারও চায় রাজ্যে হিন্দুর সংখ্যা কমে যাক।

এক সময় ভারতের হিন্দু রাজারা দ্বিধাবিভক্ত থাকার সুযোগ গিয়ে সুলতান মামুদ, মহম্মদ ঘোরি, নাদির শাহ থেকে পাঠান ও মুঘল বাদশাহ পর্যন্ত সকলেই তরবারি হাতে শাসন করেছে, তরবারি নিয়ে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করেছে। তরবারি নিয়ে হিন্দুদের মঠ মন্দির দেব-দেবীর মূর্তি ভেঙেছে। কোটি কোটি হিন্দুর ধড় থেকে মাথা নামিয়ে দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ হিন্দুনারী লুণ্ঠন করেছে আর 'গনিমতের মাল' হিসেবে ভাগবাঁটোয়ারা করে হারেমে ঢুকিয়েছে। এই নীতিতেই তারা প্রায় হাজার বছর ভারত শাসন করে গেছে। ২০১১ সালের পর থেকে এতটা না হলেও ক্ষণে ক্ষণে পশ্চিমবঙ্গে তার লক্ষণ ফুটে উঠছে।

পরবর্তীতে ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে কিছু বছরের জন্য হিন্দুরা শান্তিতে বসবাস করতে পারলেও ইংরেজ শাসনের শেষের দিকে স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দুদের তৎপরতার জন্য ইংরেজরা 'ভাগ করো এবং শাসন করো' নীতিকে সামনে রেখে চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তারা ভারতকে ভাগ করে দিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যায়। অখণ্ড ভারতকে তারা তিনখণ্ড করে দু'খণ্ড মুসলমানদের হাতে দেয় আর একখণ্ড হিন্দুদের জন্য রাখে।

ভাগবাঁটোয়ারার পর মুসলমানেরা তাদের অংশে ইসলামি শাসন কায়েম করে, সেখানে অন্য ধর্মের মানুষ বাস করার অধিকার হারায়। সে কারণে লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে তারা ধর্মান্তরিত, হত্যা ও দেশছাড়া করে। হিন্দু ভাগের অংশে যারা শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তাঁরা উদ্ভট তত্ত্ব সামনে এনে এদেশের মুসলমানরা যেন আরও শক্তিশালী হয় এবং জনবিস্ফোরণ ঘটিয়ে পুনরায় এই অংশটিকে ভাগ করতে পারে সেই ব্যবস্থা করে গেছেন।

খণ্ডিত এক অংশে হিন্দুশূন্য করা গেছে এবং অপর অংশেও হিন্দুশূন্য করার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। এ সমস্ত দেখেও এদেশে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের প্ররোচনায় এবং ভোটের লোভে কয়েকটি রাজ্যের মুসলমানরা পাকিস্তানিদের চেয়েও বেশি করে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার শুরু করেছে। এমনকী রাজ্য সরকার এখন হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার কাজে পুলিশ অফিসারকেও লাগিয়ে দিয়েছে।

দীর্ঘ ৩৪ বছরের সিপিএমের কুশাসনের অবসানে মনে হয়েছিল এবারে রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা হয়তো একটু শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। কিন্তু সে আশা দুরাশায় পর্যবসিত হয়েছে। ২০১১ সালে পট পরিবর্তনের পর হিন্দুরা আরও বেশি নির্যাতিত, উৎপীড়িত ও আতঙ্কিত। ২০২১-এর নির্বাচনের পর শাসকদল মুসলমান গুন্ডা দিয়ে যেভাবে হিন্দুদের নির্যাতন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, হত্যা ও ঘরছাড়া, রাজ্যছাড়া করেছে তা বোধ হয় একাত্তর সালে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের সমকক্ষ।

কীসের জোরে মুসলমান গুন্ডাদের এই দুঃসাহস? তারা জানে শাসকদল তাদের পক্ষে, মন্ত্রীমণ্ডলী তাদের রক্ষাকর্তা, তাদের ইঙ্গিতে পুলিশও তাদের বন্ধু। সুতরাং মস্তানি করার বড়ো সুযোগ। তৃণমূলকে ভোট দিয়ে গদিতে রাখলেই গুরুপাপেও লঘু দণ্ড হবে না। এ রাজ্যে সংখ্যালঘু জোব্বা গায়ে এঁটেই সবরকমের দুষ্কর্ম সাধন করেও সহজে পার পাওয়া যায়। মুসলমান ভোট আর ভোট মেশিনে ক্যাডারদের কারসাজিতেই কেল্লাফতে। শাসন ক্ষমতা থেকে হাজার বছরেও কেউ তাদের হঠাতে পারবে না। সুতরাং মুসলমানদের দুঃসাহস হবে না কেন?

বিভিন্ন থানায় এখন মুসলমান পুলিশ দারোগাকে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। তাদের পাশে চেয়ার নিয়ে বসে থাকে শাসকের ক্যাডারবাহিনী। লুটপাট, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাইয়ের বখরা নিতে থানা চৌহদ্দির মধ্যে ঘুরঘুর করে। বখরার কিয়দংশ যায় পার্টি ফান্ডে ও স্থানীয় পাণ্ডাদের পকেটে। ইংরেজ আমলেও পুলিশের এমন স্বর্ণযুগ ছিল না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী নামক গুচ্ছখানেক মানুষ গেলেন কোথায়? তাদের মুখে রা নেই কেন? কোথায় গেলেন শিবলিঙ্গে কন্ডোম পরানো, সীমান্ত এলাকার মুসলমানদের জন্য প্রাণ উথাল-পাথাল করা মহাজ্ঞানীরা? এদের মুখে কোনো কথা নেই কেন? বিভিন্ন সময়ে মুখে কাপড় গোঁজা রাজ্যের ধর্ষিতা মা-বোনদের মতো এদের মুখে কী আইএসআই-এর টাকা ও পেট্রোডলার গুঁজে দেওয়া হয়েছে?

পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম দুষ্কৃতীদের অত্যাচারের জোরালো প্রতিবাদ গর্জে উঠছে না। হয়তো পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা এসবের প্রতিবাদ করলে পুলিশ মারবে আর প্রতিবাদ না করলে মুসলমান মারবে। যার হাতেই হোক হিন্দুরা মরবে। এই ভেবে যদি প্রতিবাদটাই আমরা ভুলে যাই তাহলে বেঁচে থাকাটা দুরূহ হয়ে উঠবে। যারা কেবল ৫০০ বা ১০০০ টাকার লোভে ময়দানে জড়ো হতে শিখেছে, তাদের এবং তাদের পরিবারকে ধর্মান্তরকরণ করার চেষ্টা তো করবেই? বাঙ্গলার মানুষ বাঙ্গলার অগ্নিযুগের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিতে ব্যর্থ। তাই আশঙ্কা হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা ঘুমিয়ে থাকবে। □

পিয়ালি বসাক করে দেখাল

নিলয় সামন্ত

দেশের প্রথম মহিলা হিসেবে অক্সিজেনের সাহায্য ছাড়া গত অক্টোবরে ধৌলগিরি শৃঙ্গ জয় করেছিলেন পিয়ালি। তার ঠিক সাত মাসের মধ্যে আবারও অনন্য কৃতিত্বের অধিকারী হলেন তিনি। এভারেস্টের পর লোৎসেতে পা রাখলেন চন্দননগরের মেয়ে পিয়ালি বসাক। পরপর দুটি শৃঙ্গ জয় করে নজির গড়লেন তিনি। অতিরিক্ত অক্সিজেনের সাহায্য ছাড়া এভারেস্ট-লোৎসে জোড়া শৃঙ্গ অভিযান লক্ষ্য ছিল বঙ্গকন্যার। কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার জন্য ৮৪৫০ মিটার উচ্চতায় পৌঁছে বাকি পথটুকু অক্সিজেন সিলিন্ডার ব্যবহারে বাধ্য হন বছর একত্রিশের পিয়ালি।

দীর্ঘদিন ধরেই এভারেস্ট জয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন পিয়ালি। তবে তাঁর যাত্রার পথে মূল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল অর্থ। বাড়ি বন্ধক রেখে এবং নিজের যাবতীয় সঞ্চয় একত্র করেও ১৮ লক্ষ টাকার বেশি হচ্ছিল না। এদিকে, এভারেস্ট অভিযানের জন্য দরকার ছিল ৩৫ লক্ষ টাকা। নেপাল সরকার জানিয়ে দিয়েছিল, পুরো টাকা না পেলে এভারেস্ট অভিযান করতে দেবে না তারা। এই অবস্থায় ফেসবুকে পোস্ট করে সাধারণ মানুষের কাছে অর্থের আবেদন করেন পিয়ালি। সেখান থেকে আরও পাঁচ লক্ষের মতো টাকা ওঠে। তখনও দরকার ছিল ১২ লক্ষ। এমন সময় পিয়ালির সাহায্যে এগিয়ে আসে তাঁর এজেন্সি। তারাই আপাতত বাকি টাকা দিয়ে দেবে বলে জানায়। ফলে শেষ মুহূর্তে এভারেস্টে ওঠার অনুমতি পান পিয়ালি।

এভারেস্ট সামিট করে নামার সময়ে প্রবল খারাপ আবহাওয়ার মুখে পড়েছিলেন চন্দননগরের প্রাথমিক স্কুলশিক্ষিকা পিয়ালি বসাক। শরীরেও ক্রমশ জাঁকিয়ে বসছিল ক্লান্তি। সে সময়েই অল্পবিস্তর 'স্নো ব্লাইন্ড' হয়ে যান পিয়ালি। সে কারণে সর্বোচ্চ শৃঙ্গের শিখরে পৌঁছে গেলেও ক্যাম্প ৪-এ ফিরতে অনেকটা বেশি সময় লেগে গিয়েছিল তাঁর। সারাটা দিন তাই ক্যাম্প ৪-এই থাকতে হয়েছিল।

সাধারণত অধিক উচ্চতায় বরফের উপরে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে চোখে পড়লে কেউ 'স্নো ব্লাইন্ড' হতে পারেন। এক্ষেত্রে নীচে নেমে এসে দু'তিন দিনের বিশ্রামেই সেই সমস্যা সেরে যেতে পারে। বিশিষ্ট পর্বতারোহী বসন্ত সিংহ রায় বলছেন, 'এভারেস্ট সামিট থেকে নামার সময়ে নীচে তাকিয়ে নামতে হয়। ফলে তখন স্নো গগলসের ফাঁক দিয়ে বরফের দিকে তাকাতে হয় বলে স্নো ব্লাউন্ড হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। ২০১০ সালে সামিট করে ফিরে আমার চোখেও কিছুটা সমস্যা হয়েছিল। তবে দ্রুত সেরেও গিয়েছিল। তবে এইসব ক্ষেত্রে একা একা চলাফেরা করাটাও রীতিমতো ঝুঁকির হয়ে যায়।'

ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশনের (আইএমএফ) পূর্বাঞ্চলীয় শাখার চেয়ারপার্সন ও পর্বতারোহী দেবরাজ দত্ত জানাচ্ছেন, অভিযাত্রী দীর্ঘ সময় ধরে স্নো গগলস খুলে রাখলেও এই সমস্যা হতে পারে। 'হয়তো খারাপ আবহাওয়ায় ফেরার পথে গগলস খুলেছিলেন পিয়ালি, তাই চোখে অতিবেগুনি রশ্মি বা ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা লেগে স্নো ব্লাইন্ডনেস হয়েছে। অল্প সমস্যা হলে এক-দু'দিনের বিশ্রামেই সেরে যাওয়ার কথা।' ---বলছেন দেবরাজ। অতিরিক্ত অক্সিজেন ছাড়া এভারেস্টের পথে এগোনোর ভাবনাটাই তাবড় তাবড় পর্বতারোহীকে কাঁপিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। সেখানে বাঙ্গলারই একটি মেয়ে যে তা ভাবতে পেরেছে এবং সেই পথে এগিয়েছে— এটাই একটা বিরাট প্রাপ্তি'।

তিনি আরও বলেন, ২০১৫ সালে প্রথম এভারেস্টে গিয়েও ভূমিকম্পের কারণে অভিযান বাতিল হওয়ার পরে বুঝেছিলাম, স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার পরে তাকে ফের নতুন করে ভাবতে কতটা দম লাগে। পিয়ালি সেটাও করে দেখাল। ওর প্রথম এভারেস্ট অভিযান অসফল হওয়ার পরেও যে ও হাল ছাড়েনি, বরং নতুন উদ্যমে সেই পথে ফিরেছে— এটা শিক্ষণীয়। তাই আজ এভারেস্টের শীর্ষে পৌঁছনো বাঙ্গালি মহিলাদের নামের তালিকায় কুঙ্গা ভুটিয়া, শিপ্রা মজুমদার, ছন্দা গায়েন, টুসি দাসের পরে জুড়ে যাচ্ছে পিয়ালির নামও।

২০১৬ সালে এভারেস্টে ৮৮০০ মিটার উচ্চতায় আমার অক্সিজেন মাস্ক কাজ করেনি, প্রায় আধ ঘণ্টা অক্সিজেন ছাড়া কাটিয়েছিলাম। ডেথ জোনে বাতাসে অক্সিজেনের মাত্রা এক তৃতীয়াংশ হয়ে যাওয়ায় তাতে এক এক জনের শরীর এক এক রকম ভাবে আচরণ করে থাকে। আমার যেমন ঘুম পাচ্ছিল, এক চোখে কিছুক্ষণ দেখতে পাইনি। তাই জানি, ব্যাপারটা কতটা কঠিন। বেঁচে ফিরে আসতে তাই শেষ পর্যন্ত পিয়ালির অতিরিক্ত অক্সিজেন ব্যবহারের সিদ্ধান্ত একেবারে সঠিক। কারণ বড়ো পর্বতরোহীরা বলেন, 'সামিটে পৌঁছনোটা ঐচ্ছিক, ফিরে আসাটা বাধ্যতামূলক।'

■

পরিশ্রম করো, বড়ো হও

ঢাকুরিয়ায় বিবেকানন্দ পার্কের লাগোয়া দোকানটায় বরাবর ঠোঙা বিক্রি করে সরমা। এই চত্বরে এটাই বড়ো দোকান। চিপস, কোল্ড ড্রিংকস, বাদামতক্তি থেকে শুরু করে সবই পাওয়া যায় এই লক্ষ্মীনারায়ণ স্টোর্সে। যাদবপুরের রেল কলোনিতে থাকে সরমারা। স্বামী, স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ে। সরমার স্বামী রবীন ট্রেনে হকারি করে। দিন আনা দিন খাওয়া চারজনের সংসার। রবীনের স্বল্প আয়ে চারটে পেট চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। সেজন্য সরমা বাড়িতেই ঠোঙা বানায়। দোকানে দোকানে বিক্রি করে। সরমার বড়ো ছেলে সোনাই। ক্লাস থ্রিতে পড়ে। তারপরে মেয়ে মিলি।

আজ স্কুলে জামাই ষষ্ঠীর ছুটি দিয়েছে। আজ আবার গরমটা বেশিই পড়েছে। এই সকালেই চাঁদি ফেটে যাচ্ছে। সকাল সকাল সোনাইকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছে সরমা। বেলা বাড়লে রোদের তাপ আরও বাড়বে। পার্কটা বেশ বড়ো। এক পাশে ক্রিকেট খেলা শেখানো হচ্ছে। পুরো পার্কটা গোল করে ছাউনি দেওয়া। লক্ষ্মীনারায়ণ স্টোর্সের কাছে বাচ্চাদের ভিড়। এটা-ওটা কিনছে। সরমা একটু দূরে ঠোঙার ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে. সোনাই মায়ের আঁচলের আড়াল থেকে ওই বাচ্চাগুলোর দিকে জুলু জুলু চোখে দেখছে। কেউ চিপস কিনছে, কেউ ফ্রুটি, কেউ-বা বাদামতক্তি । ভিড় কমতেই দোকানের সামনে এগিয়ে এল সরমা।

দোকানের ছেলেটি সীতারাম। সরমাকে দেখে বলল, বউদি, ঠোঙা এনেছেন? সরমা বলল পাঁচ দিস্তা। — আগের বারের ঠোঙাগুলো কিন্তু ভালো ছিল না। খোলার সঙ্গে সঙ্গে সব ছিঁড়ে যাচ্ছে। একটু ভালো কাগজের বানাবেন। না হলে আর নেওয়া যাবে না। এক নিঃশ্বাসে বলে গেল সীতারাম। কথাগুলো শুনলো সরমা। বলার কিছু নেই। কারণ কাগজের দাম বেড়েছে। গতবারের কাগজগুলো বেশ পুরনো ও ভেজা ভেজা ছিল বলে একটু কম দামে পাওয়া গেছিল। তাই ওরকম হয়েছে। সরমা ঠোঙার দাম নিতে নিতে বলল, এবার থেকে ভালো কাগজের দেব ভাই। এগুলো একটু চালিয়ে নাও।

পাশে বেঞ্চিতে বসে এক ভদ্রলোক তাদের দেখছিলেন। ঠোঙার টাকাগুলো আঁচলে বেঁধে চলে আসছিল সরমা। সোনাই মায়ের আঁচল টেনে ধরল। ছেলের দিকে তাকাতেই সোনাই দোকানের বয়ামে রাখা বাদামতক্তির দিকে

ইশারা করল। রাগী চোখে সোনাইয়ের দিকে চেয়ে মা বলল 'না'। কিন্তু সোনাই নাছোড়। অনুনয়ের সুরে বলল দাও না মা। খিদে পেয়েছে। সরমা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, বললাম তো না। সকালে টিফিন খেয়েছিস, এর মধ্যে খিদে পেয়ে গেল? তাছাড়া আমার কাছে পয়সা নেই। মায়ের বকুনি খেয়ে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল সোনাই। কাঁদতে কাঁদতেই বলল দাও না মা, আর কোনোদিন চাইব না।

বেঞ্চিতে বসে থাকা ভদ্রলোক বলে উঠলেন, দিদি, দিয়ে দিন না কিনে। বাচ্চাটা কাঁদছে। সরমা বলল আসলে আমার সামর্থ্য নেই। তাছাড়া বাচ্চারা কান্নাকাটি করলেই যে তাদের দিতে হবে তার মানে নেই। বলেই সরমা হাঁটতে শুরু করল। ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি দোকান থেকে বাদাম তক্তির একটা প্যাকেট কিনে নিয়ে সোনাইয়ের হাতে ধরিয়ে দিলেন। সরমা ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বলল আপনি ওর হাতে ওটা দিলেন কেন? ভদ্রলোক কাচুমাচু মুখে বললেন, বাচ্চাটা কাঁদছিল তো তাই। সরমা বলল আপনাকে তো বললাম বাচ্চারা বায়না ধরবেই। আমাদের মতো গরিবের ঘরে বায়না পূরণ করার সাধ্য হয় না সবসময়। এভাবে বাচ্চাদের আশকারা দেবেন না। যদি দিতে হয় কিছু পুরনো খবরের কাগজ কিনে দিন না, তা দিয়ে ঠোঙা বানাতে ও মাকে সাহায্য করবে। তারপর সেই পরিশ্রমের টাকায় ও যা খেতে চাইবে আমি কিনে দেবো।

সরমার কথায় ভদ্রলোক স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। মনে মনে এই মাকে কুর্নিশ না করে পারলেন না। সরমা বাড়ি ফিরে গেল। ভদ্রলোক কয়েক কেজি পুরনো খবরের কাগজ কিনে সীতারামের দোকানে দিয়ে বললেন, ঠোঙা বিক্রি করতে যিনি এসেছিলেন তার হাতে যেন দিয়ে দেয় সে।

তিন-চার দিন পর সরমা লক্ষ্মীনারায়ণ স্টোর্সে এসে সেই ভদ্রলোকের দিয়ে যাওয়া খবরের কাগজ দেখে অবাক হলো। সরমা কাগজের দামটা দিয়ে মনে মনে ধন্যবাদ জানালো তাঁকে। আরও বেশ কয়েকদিন পর এক রবিবার সরমা পাঁচদিস্তা ঠোঙা নিয়ে এল সীতারামের দোকানে। সেদিনও সরমার সঙ্গে সোনাই। সরমা ঠোঙা বিক্রির দাম নেওয়ার পর একটা বাদামতক্তির প্যাকেট কিনে সোনাইয়ের হাতে দিল। সেদিনও পাশের বেঞ্চিতে সেই ভদ্রলোক বসে আছেন। মাটির ভাঁড়ে চা খাচ্ছেন। সোনাইয়ের দিকে তাকিয়ে তিনি হাসলেন। সরমা ভদ্রলোককে বলল, এটা ওর নিজের পরিশ্রমের টাকায়।। আমি ঠোঙা বানাচ্ছিলাম, ও আমাকে হাতে হাতে সাহায্য করেছে। তাই ওকে আজ বাদামতক্তি কিনে দিলাম। শুনে সীতারাম বাঃ বাঃ করে উঠল। ভদ্রলোক সীতারামকে বললেন, এমন মা ঘরে ঘরে থাকলে দেশে আদর্শ মানুষ তৈরি হবে। সবাই পরিশ্রমের বিনিময়ে উপার্জন করতে শিখবে। এমন মাকে প্রণাম করতে ইচ্ছে করে।

@নিচি

ভারতের বিপ্লবী

মহেন্দ্রনাথ রায়

বিপ্লবী মহেন্দ্রনাথ রায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম ব্যক্তিত্ব। ১৯১৯ সালে ডিসেম্বর মাসে মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় অভিযুক্ত হয়ে ধরা পড়েন। বিচারে কয়েক বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। পরে আপিলে মুক্তি পান। বিপ্লবী কাজকর্মে সক্রিয় হলে আবার ধরা পড়েন। তাঁকে রাজস্থানের দেউলি জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। পুলিশের নির্মম অত্যাচারে জেলখানায় তাঁর মৃত্যু হয়।

জানো কী?

- গুজরাট রাজ্যের আঞ্চলিক চলচ্চিত্র ঢলিউড নামে পরিচিত।
- সহস্র পাহাড়ের দেশ বলা হয় রুয়ান্ডাকে।
- নেলসন ম্যান্ডেলাকে কালো গান্ধী বলা হয়।
- কুমার গুপ্তের আমলে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়।
- পশ্চিমবঙ্গে রেশম শিল্পে প্রথম জেলা মুর্শিদাবাদ।
- বৈদ্যুতিক বাল্বের ফিলামেন্ট তৈরি হয় টাংস্টেন দিয়ে।
- পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য নৃত্যের নাম গৌড়ীয় নৃত্য।

ভালো কথা

দাদুর বন্ধু

কাঠবেড়ালি যে মানুষের বন্ধু হতে পারে আমার ধারণাই ছিল না। এবার গরমের ছুটিতে মামার বাড়ি যেতেই দাদু আমাকে আর ভাইকে একটু আদর করে বলল কাল তোমাদের একটা জিনিস দেখাবো। পরদিন সকালে দাদু আমাদের নিয়ে বাগানে গেলেন। দাদুর হাতে এক ঠোঙা চীনা বাদাম। দাদু একটা শিস দিলেন। তারপর অবাক কাণ্ড। গাছ থেকে পিল পিল করে কাঠবেড়ালি নেমে আসতে লাগল। দাদু ঠোঙা থেকে ওদের বাদাম দিতে লাগলেন। ওরা দাদুর হাত থেকেই খেতে লাগল। আমরা দাদুর কাছেই বসেছিলাম। খাওয়া শেষ হলে ওরা দাদুর ঘাড়ে, মাথায় উঠে খেলা করতে লাগল। আমরাও ওদের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। ওরা একটুকুও ভয় করছে না। দাদু বলল এরা ভয় করে না । এরা যে আমার বন্ধু।

সুস্মিতা বর্মণ, একাদশশ্রেণী, লাটাগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

নাজেহাল

সৌমী হালদার, দশমশ্রেণী, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগনা।

বেজায় গরম আর রৌদ্রতাপ
মাঝে মাঝে বৃষ্টি
বোশেখ মাস চলে গেল
এ কী অনাসৃষ্টি।
আম পাকছে জাম পাকছে
কাঁঠাল পাকার সময় হলো।
ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নাই
ডোবার মাছ সবই ম'লো।
মাঝে মাঝে একটু বৃষ্টি
তাতে হচ্ছে ঘাম
রোদের তাপটি কড়া তবু
পাকছে গাছের জাম।
এত গরম এত তাপে
পাকে গাছের তাল
এই গরমে কারেন্ট গেলে
সবাই নাজেহাল।

কবিতা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

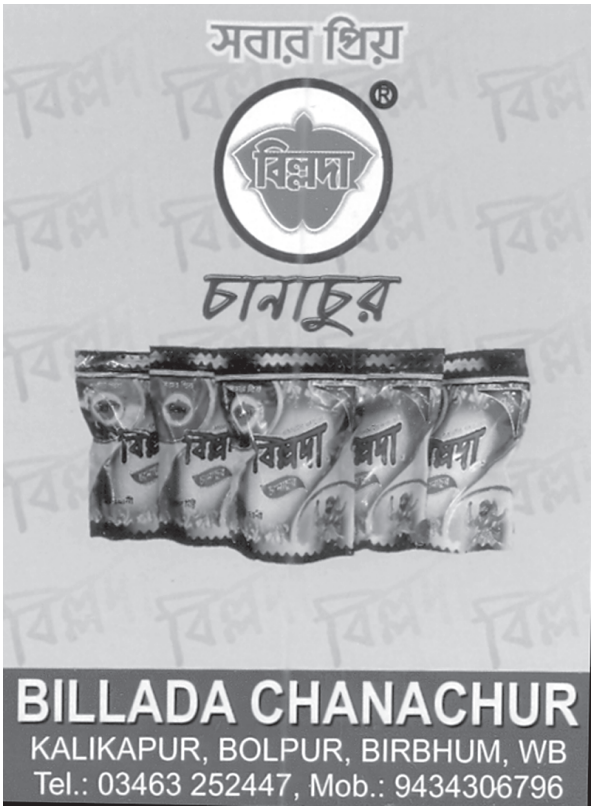

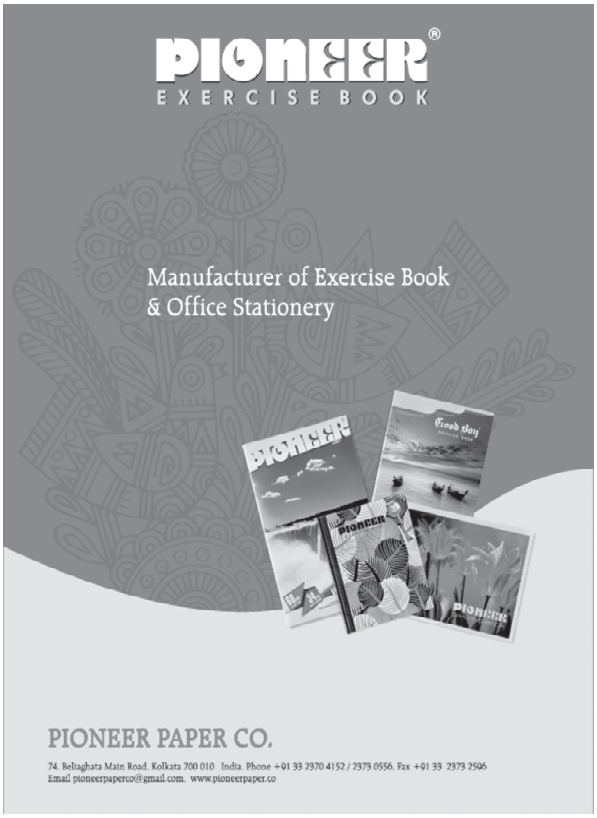

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

নাস্তিক মার্কসবাদীদের ধর্মপ্রীতি

ধীরেন দেবনাথ

অবশেষে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিএম)-র কমরেডদের ঘটেছে বিলম্বিত বোধোদয়। যাঁরা দীর্ঘকাল ধর্মকে আফিম আখ্যা দিয়ে ব্রাত্য করে রেখেছিলেন তাঁরাই নাকি আবার এতকাল পরে হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন। ধর্ম থেকে শত দূরে থাকা কমরেডদের মুখে এসব কথা শুনে হাসি পায় বটে! তবে একথাও অনস্বীকার্য যে, ভারতবর্ষে হিন্দুত্বের উত্থান ঘটায় বামপন্থায় নেমেছে ব্যাপক ধস। বহু বামপন্থী বনে গিয়েছেন রামপন্থী বা ডানপন্থী। ফলে বামপন্থায় লেগেছে ভাটার টান এবং সেই টান এতটাই জোরালো যে এই রাজ্যের বিগত

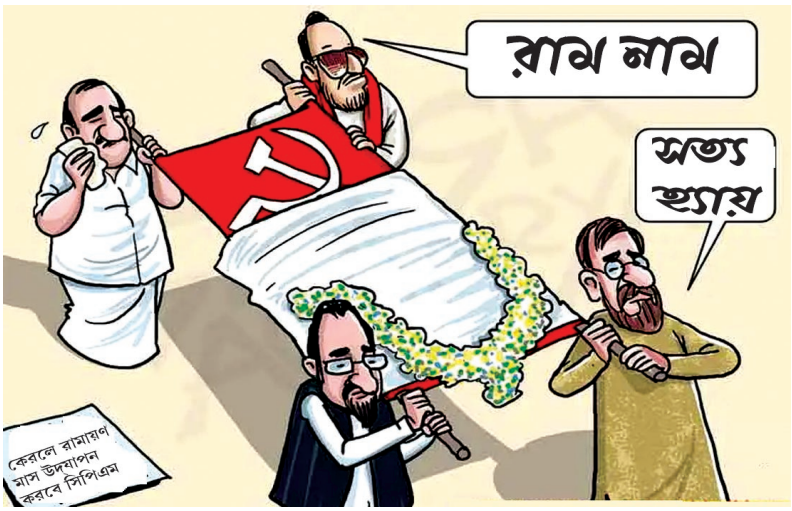

বিধানসভা নির্বাচনে তারা খাতা খুলতেই পারেননি। অথচ যে বিজেপিকে তাঁরা সাম্প্রদায়িক, মনুবাদী ইত্যাদি বলে সর্বদা গালিগালাজ এবং রাজ্যের বিগত বিধান সভার নির্বাচনী জনসভাগুলিতে বিজেপির আদ্যশ্রাদ্ধ করে সভা গরম ও উত্তেজিত করার পরেও সেই বিজেপি পেয়েছে ৭৭টি আসন। তাই নিজেদের নৈরাশ্যজনক ফলাফল ও বিজেপির উত্থানে স্বভাবতই হতাশ, উদ্বিগ্ন ও ছন্নছাড়া কমরেডরা। তাঁরা ভুগছেন সিদ্ধান্তহীনতায়।

আসলে মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের অধঃপতনের মূল কারণ হচ্ছে তাঁদের নীতি। মার্কসবাদ, লেনিনবাদ, মাওবাদ প্রভৃতি বিদেশি স্বৈরাচারী, একনায়কতান্ত্রিক ও নাস্তিকতাবাদী মতবাদকে ভারতের মতো ধর্মপরায়ণ, সর্বসমাবেশক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই আদর্শহীন কমিউনিস্ট এই দলটা অস্তিত্বহীনতা তথা হীনমন্যতায় ভুগছে। অথচ একদা এই মার্কসবাদীদের কী বিশাল প্রতাপ-প্রতিপত্তিই না ছিল! স্বৈরতান্ত্রিক উপায়ে এঁরা মানুষের কণ্ঠরোধ করেছেন। ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। ক্ষমতার দম্ভে দিক্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে এঁরা রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া কবি, স্বামী বিবেকানন্দকে ভণ্ড সন্ন্যাসী, নেজাতী সুভাষকে তোজোর কুকুর বলতেও দ্বিধাবোধ করেননি। শ্রীরামকৃষ্ণকে মৃগীরোগী বলতেও ছাড়েননি। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, বেদ, পুরাণকে বলেছেন কাল্পনিক ইতিহাস। দেব-দেবীদের নিয়ে করতো হাসি-ঠাট্টা, তামাশা,রসিকতা ও কুরুচিকর মন্তব্য। নিজেদের 'সেকুলারবাদী' প্রমাণ করতে তাঁরা প্রকাশ্য রাস্তায় বসে গোমাংস ভক্ষণ করলেও শুয়োরের মাংস থেকে থাকতেন শতহাত দূরে। দুর্গাপুজো, কালীপুজোয় মন্দিরে তাঁদের দেখা না গেলেও টুপি পরিহিত হিন্দু কমরেডরা শোভাবর্ধন করতেন ইফতার পার্টিতে। আবার মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী তারাপীঠে মা-তারার পুজো দিয়ে 'জয় মা-তারা' ধ্বনি দিলে এবং রেজ্জাক মোল্লা 'হাজি' হলে তাঁদের শুনতে হয়েছে নানা বিরূপ মন্তব্য। সাম্যবাদের প্রবক্তা মার্কস- লেলিন নন। কারণ তাঁদের জন্মের বহু পূর্বে ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সাম্যের বাণী প্রচার করেন এবং অবহেলিত তথা নিম্নবর্গীয়দের বুকে তুলে নেন। তাই শ্রীচৈতন্যই সাম্যবাদের প্রথম প্রবক্তা। আর ভণ্ড কমিউনিস্টরাই বলেছিলেন, 'পাকিস্তান দাবি ন্যায্য দাবি। পাকিস্তান দিতে হবে, তবেই ভারত স্বাধীন হবে।' দেশদ্রোহী আর কাকে বলে? প্রগতিবাদের ধ্বজাধারী কমিউনিস্ট মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু প্রাথমিক থেকে ইংরেজি তুলে দিয়েছিলেন এবং দেশীয় কর্মসংস্থানের স্বার্থে কম্পিউটারের ব্যবহারই বন্ধ করতে চেয়েছিলেন।

জ্যোতিবাবু, সুভাষবাবুরা প্রয়াত। আর হাজি রেজ্জাক তৃণমূলের এম.এল.এ। একদা জমজমাট পার্টি অফিসগুলো এখন খাঁখাঁ করছে। তাছাড়া মে দিবসে রাস্তায় মানুষের ঢল নামত। কিন্তু এখন মে দিবস পালিত হয় কোনোরকমে। পার্টির বহু নেতা-কর্মী-সমর্থক দল ছেড়েছেন। তাই একদা যে কমরেডরা 'সর্বহারার একনায়কতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার কথা বলতেন, তাঁরাই আজ সর্বহারা। তাঁরা হিন্দু ভোটে দাঁও মারতে রামনবমী দুর্গাপুজো, দীপাবলি, হনুমান জয়ন্তীসহ সব ধর্মীয়, অনুষ্ঠান, এমনকী ঈদ, মহরম, খ্রিস্টমাস, বুদ্ধপূর্ণিমা, মহাবীর জয়ন্তী ইত্যাদি পালন করবেন এবং ইতিমধ্যেই নাকি পালন শুরু করেও দিয়েছেন। একেই বলে, 'ঠেলার নাম বাবাজি'। অবশ্য রাজনৈতিক মহলের ধারণা, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশের চলমান রাজনীতিতে টিকে থাকতেই কমিউনিস্টদের এই লোকদেখানো পরিবর্তন। এ ব্যাপারে সিপিএমের তামিলনাড়ুর রাজ্য সম্পাদক বালকৃষ্ণনের বক্তব্য, 'মন্দিরগুলিতে সঙ্ঘ পরিবারের আধিপত্য রুখতে তাঁদের এই প্রয়াস।

বালকৃষ্ণনদের কাছে প্রশ্ন, মার্কসবাদীরা যদি ধর্মে বিশ্বাসী হন, তাহলে আপনারা কেন ধর্মকে আফিম বলেছেন? আসলে আদর্শগত কারণে নয়, ক্ষমতার লোভে আপনারা এতটাই বেসামাল হয়ে পড়েছেন যে ইতিহাসকে আপনারা ভুলিয়ে দিতে চাইছেন। কিন্তু তাতে কী আর চিড়ে ভিজবে? মানুষ আপনাদের আর বিশ্বাস করবে? আপনারা 'সর্বহারা'র নাম করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যে প্রতারণা করেছেন, তা ক্ষমার অযোগ্য। আপনাদের উদ্দেশ্য সাধু হলে বোঝা যাবে দেরিতে হলেও আপনাদের বোধোদয় ঘটেছে। আপনারা ভারতীয় হয়ে উঠতে পেরেছেন। আর ভবিষ্যতেই এর প্রমাণ মিলবে। এতকাল আপনারা ধর্মের ছোঁওয়া থেকে গা বাঁচাতে পুজোমণ্ডপের বাইরে বুকস্টলে পার্টির সাহিত্য বিক্রি করতেন। আগামীতে দেখা যাবে আপনারা কতটা ধার্মিক হয়ে উঠেছেন। সেটাই হবে আপনাদের অগ্নিপরীক্ষা। □

ফঃ ৬

ভারত ভাগের সমর্থক সর্বকালের সেরা বাঙ্গালি

রুদ্র প্রসন্ন ব্যানার্জী

শেখ মুজিবুর তো দেশ ভাগ সমর্থন করেছিলেন, তাই না? দেশ ভাগের পরেও তো দিব্বি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন নিয়েই বেঁচে ছিলেন। যখন ভোটে জেতার

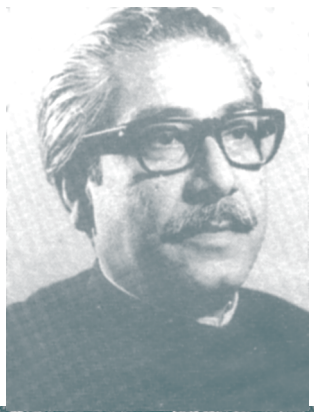

পরেও পশ্চিম-পাকিস্তান তাঁকে প্রধানমন্ত্রী হতে দিল না তখন তিনি ভাষাকে হাতিয়ার করে নতুন দেশ গঠনের জন্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর শরণাপন্ন হলেন। তাহলে তাঁর প্রথম পরিচয় ছিল একজন মুসলমান তারপরে বাঙ্গালি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মুক্তি-যুদ্ধের সময় যেসব হিন্দু-বাঙ্গালি বাংলাদেশ ত্যাগ করে ভারতে শরণার্থী হিসেবে এসেছিলেন তাদের নিজেদের ভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনো প্রচেষ্টা তিনি করেননি। উলটে ১৯৭১ সাল অব্দি তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান যা পরে বাংলাদেশ হয় সেখানে হিন্দুদের উপর ঘটে যাওয়া সমস্ত গণহত্যা তিনি সমর্থন করেছিলেন। কারণ তিনি কোনোরূপ প্রতিবাদ করেননি। এরকম গণহত্যার সমর্থক এবং ক্ষমতালোভী একজন মানুষকে কীভাবে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালির মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে?

যদি বাংলা ভাষায় কথা বলাই বাঙ্গালি হওয়ার একমাত্র মাপকাঠি হয়ে থাকে তাহলে নেতাজী সুভাষ বসু যেভাবে প্রায় একক ক্ষমতায় সরাসরি সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত নাড়িয়ে দিয়ে অখণ্ড ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন তাতে তাঁকেই সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি বলে বিবেচনা করা উচিত। আর যদি শান্তি স্থাপনের দিক থেকে বিবেচনা করা হয় তাহলে ১৮৯৩-এ শিকাগোর বিশ্বধর্ম সম্মেলনে যে সর্বত্যাগী হিন্দু সন্ন্যাসী প্রকৃত ধর্মের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন সেই স্বামী বিবেকানন্দকে সর্বকালের সেরা বাঙ্গালি মেনে নেওয়া উচিত। আর যদি স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রেরণা জোগানোর দিক থেকে বিচার করা হয় তাহলে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নাইট উপাধি ত্যাগ করা বা বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরোধিতা করা নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি হিসেবে মেনে নেওয়া উচিত। বিজ্ঞানের বিষয় বিবেচনা করলে জগদীশ চন্দ্র বসু বা সত্যেন্দ্রনাথ বসু অবশ্যই এগিয়ে থাকবেন। কিন্তু কোনোভাবেই কয়েক কোটি হিন্দুকে শরণার্থী বানানো শেখ মুজিবুর রহমানকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি হিসেবে মেনে নেওয়া যায় না।

এখন প্রশ্ন হলো, বিবিসি-র ভোটাভুটিতে কীভাবে শেখ মুজিবুরকে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি ঘোষণা করা হলো? বিবিসি-র প্রকাশিত সেই লিস্টে ২০তম স্থানে রয়েছেন ১৯৪৬-এর দি গ্রেট কলকাতা কিলিঙের মহানায়ক সোহরাওয়ার্দি। এটা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে যারা ভোট দিয়েছিলেন তাদের বৃহৎ সংখ্যা ছিল বাংলাদেশি মুসলমান। যদি এই ধারণাই সত্যি হয় তাহলে ভারতীয় বা মূলত পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিরা তা মেনে নিলেন কীভাবে? খুব সহজ উত্তর হলো, গত ৪৪ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গকে সাম্যবাদের গবেষণাগার হিসেবে ব্যবহার করে হিন্দু বাঙ্গালিদের অর্থনৈতিক ভাবে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের তাই আওয়াজ তোলার মতো কোনো অবস্থা বর্তমান নেই। সিনেমাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে জনসমাজের সামনে বার্তা তুলে ধরা যেতে পারতো কিন্তু এখন পশ্চিমবঙ্গের চিত্রপরিচালকরা আরব সাম্রাজ্যবাদের কাটা কলা মুখে ঢুকিয়ে বাংলাদেশের মার্কেটের কথা মাথায় রেখে হিন্দু ধর্মকে ছোটো করে দেখিয়ে সিনেমা বানান।

বাস্তব সত্যি হলো হিন্দু বাঙ্গালির হাতে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা আর নির্ভরশীল নয়। আর যতদিন নবান্নকে বিদেশে বসে থাকা বামপন্থী অর্থনীতিবিদদের গবেষণাগার হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হবে ততদিন আমাদের মাথা নীচু করেই থাকতে হবে। কারণ আজকের দিনে অর্থনীতিই সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। আর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো, আমাদের রাজ্যের ৩৪ বছরের বাম শাসন ব্যবস্থায় কালচারাল মার্কসিজমকে হাতিয়ার করে মানুষকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ওপর বাংলা থেকে লাথি খেয়ে মা-বোনেদের ইজ্জত বাঁচাতে কেন চলে আসতে হয়েছিল শ্যামাপ্রসাদের সৃষ্টি করা পশ্চিমবঙ্গে? যে জ্যোতি বসু মুসলিম লিগের সমর্থনে ১৯৪৬-এ বেঙ্গল-অসম রেলওয়ে এমপ্লয়িজ-এর ভোট লড়েছিলেন সেই জ্যোতি বসুর উত্তরসূরিরা যদি আমাদের ইতিহাস বোঝাতে আসেন তাহলে তা খুবই দুঃখের। তারা তোজোর কুকুর বা বুর্জুয়া কবি হিসেবে আমাদের মনীষীদের অপমান করেছিলেন। তাই অর্থনীতির সঙ্গে আমরা সাংস্কৃতিকগত ভাবেও দেওলিয়া হয়ে গেছিলাম আর এখন তো আবার 'অনুপ্রেরণা'য় বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য থেকে সাহিত্য অ্যাকাডেমি সবজায়গাতেই তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য দেখতে হচ্ছে।

বাঙ্গালি হিসেবে নিজেদের লজ্জাবোধ আর কত বাড়িয়ে চলবো আমরা? □

শিক্ষকদের যথার্থ প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বুঝেছে সরকার

শেখর সেনগুপ্ত

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এ অবধি দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে যে সমস্ত সংস্কারে ব্রতী হয়েছেন, তার সবগুলিকে যাঁরা রাজনৈতিক বৈতরণী পারের প্রয়াস বলে ভাবেন, তাঁদের স্বরে স্বর মেলালে নিজের প্রতিই অবিচার করা হবে। বরং অধিকাংশ সংস্কারগুলিই রাজনীতি নির্ভর নয়, বেশিরভাগ সংস্কারই হলো বহুবিধ মরচে-ধরা নীতিশূন্য ব্যবস্থার বাদুড়সম ডানা ঝাপটানোকে বন্ধ করবার প্রয়াস। এই সংস্কারগুলির মধ্যে অন্যতম হলো নব শিক্ষানীতি— যার কার্যকারিতা শুরু হয়েছে ২০২০ সালে এবং তাবৎ দুর্বল রেখাকে সরিয়ে প্রকৃত শিক্ষার অভিষেক ঘটাতে সময় লাগবে আরও কয়েক বছর। নতুন শিক্ষানীতি নিয়ে আমি ইতিপূর্বে 'স্বস্তিকা'য় আলোচনা করেছি; এবারের বিষয় হলো শিক্ষার ভুবনে পরিত্যক্ত জঞ্জাল অপসারনের দায়িত্ব যাঁদের, সেই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যথার্থ দক্ষ কর্তব্যপরায়ণ করে তুলতে সরকার কী কী ব্যবস্থাদি নিয়েছে বা নিতে চলেছে।

নেহেরুজী রাশিয়াকে মৌখিক আদর্শস্থল বানিয়ে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিলেও দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাননি। তাঁর কন্যা ইন্দিরা গান্ধী বেশ কিছু ধুন্ধুমার কাণ্ড সাফল্যের সঙ্গে করতে পারলেও মানুষ গড়ার কারিগরদের দিকে ঘুরে তাকাননি বারেকের জন্যও। এই রকম কদাকার উপেক্ষার বিপরীতে প্রথম পরিবর্তনের ডঙ্কা বেজে ওঠে ২০০৫ সালে। এই সময়ই নয়া দিল্লির শিক্ষামন্ত্রক গঠন করে National curriculum Frame Work। সরকার যে শিক্ষা এবং শিক্ষকদের নিয়ে অবশেষে সক্রিয় হচ্ছেন, আমরা প্রথম অনুভব করলাম। সংস্কার গতি পায় ২০০৯ সালে, যখন দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে অধিকতর কার্যকরী, অর্থপূর্ণ এবং বন্দিত্বমুক্ত অবস্থায় আনতে কার্যকর হলো আর একটি প্রকল্প— National Curriculum Frame Work Specially for Teachers' Education। যাঁরা শিক্ষা প্রদান করবেন, বশে রাখবেন শিক্ষার্থীদের, তাঁদের প্রশিক্ষিত করতে হবে না? যদি না হয়, তাহলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাটাই ভ্রান্তিপূর্ণ শিকলে বাঁধা থেকে যাবে আরও বছরের পর বছর, হয়তো যুগের পর যুগ। এই বছরই তাই শিক্ষক- শিক্ষিকাদের আর কেবল পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। শিক্ষার প্রসারণ ঘটবে আরও বহু বিষয়ের চর্চার মধ্য দিয়ে। ২০১২ সালে নিযুক্ত হয়েছিল ভার্মা কমিশন। তাদের রিপোর্টে সেই কমিশন বললো, 'শিক্ষকদের অবহিত করতে হবে যে তাঁদের দায়িত্বের পরিধি কী বিশাল। কেবল হাত-পা ছুঁড়ে ক্লাসে বক্তৃতা দিলেই হবে না। তাঁরাই তো মানুষ গড়ার কারিগর। সামগ্রিকভাবে এই দেশের মানবসম্পদের উন্নয়নে তাঁদেরই ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকরা নিজেরাই যদি নীতিবোধে ঋজু না হয়ে উঠতে পারেন, দেশ ক্রমেই পিছিয়ে পড়বে।'

ভার্মা কমিশনের মতামতকে মান্যতা দিয়ে সরকার ২০১৪ সালে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে আর গরাদহীন জানালা করে রাখতে চাইলেন না। গঠন করলেন National Council For Teachers' Education (সংক্ষেপে NCTE)। অর্থাৎ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তৈরি করবার শিক্ষণব্যবস্থাকেও ঢেলে সাজাতে হবে।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ডকে পোক্ত করে। তাই এখানে থাকবে যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণের গুরুত্ব। ভাগ্য ও সুপারিশের ভাগবাঁটোয়ারার দিন শেষ।

কেবলমাত্র স্কুল-কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণই যথেষ্ট নয়, কীভাবে সক্ষম বা কোণঠাসা ছাত্র সমাজকে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া উচিত, সেই ব্যাপারেও প্রকৃত প্রশিক্ষিত হতে হবে শিক্ষকসমাজকে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাঠগ্রহণের সময়সীমাকেও তাই বাড়ানো হলো এক বছরের বদলে দু'বছর। এমতো সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ইতিউতি কিছু প্রাণান্তিক আর্তনাদ শোনা গেলেও তা শুভবুদ্ধির নিকট পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হয়েছে। অতঃপর ২০২০ সালে বর্তমান সরকার নতুন শিক্ষানীতি ঘোষণা করলে শিক্ষক-প্রশিক্ষণের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। শিক্ষাভুবনের পুনর্গঠন এখন চলছে আরও নিষ্ঠা ও সতর্কতার সঙ্গে। শিক্ষকের দায়িত্বলাভ আর এখন বরাতের ব্যাপার নয়, তা নির্ভর করে যুগপৎ মেধা ও প্রশিক্ষণের ওপর। বর্তমান শিক্ষানীতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নরেন্দ্র মোদী বললেন, 'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ডকে পোক্ত করে। এখানে তাই থাকবে যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণের গুরুত্ব। ভাগ্য ও সুপারিশের ভাগবাঁটোয়ারার দিন শেষ। আমরা চাই, যাঁরা উপযুক্ত শিক্ষক, সেই বিদ্বান, বিজ্ঞ, দৃঢ়চেতা ও দেশপ্রেমীরাই ডাক দেবেন— হারি আপ, আসুন, আমরা দেশ ও জাতিগঠনে আত্মনিয়োগ করি।' ▯

প্রয়াত ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের একনিষ্ঠ কার্যকর্তা স্বদেশ রঞ্জন ঘোষ

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী॥ মুর্শিদাবাদ জেলায় ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের অন্যতম স্থপতি তিনি; সংগঠন বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ কার্যকর্তা। স্বদেশ রঞ্জন ঘোষ। ১৯৮২ সাল থেকে 'ভারতীয় কিষান সঙ্ঘ' নামক সংগঠনটি পশ্চিমবঙ্গ সাংগঠনিক কাজ শুরু করে (ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা ১৯৭৯ সালে)। আর তখন থেকেই স্বদেশবাবু এই সংগঠনের সক্রিয় সদস্য হন। খুবই আবেগ প্রবণ উদার মনের মানুষ ছিলেন তিনি; একজন বড়ো কৃষকও। তাই জেলার কৃষকদের মধ্যে জনপ্রিয় হতে সময় লাগেনি তাঁর। কৃষি কাজে নিত্যনতুন গবেষণার সঙ্গে সর্বদা পরিচিত হতে ভালোবাসতেন। এবং সেই উদ্দেশ্যে রাজ্যের অন্যতম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় 'বিসিকেভি'-তেও উপস্থিত হতেন এবং প্রশিক্ষণ নিতেন।

স্বদেশবাবুর জন্ম ১৯৪৭ সালের ১১ জুলাই। মুর্শিদাবাদ জেলার নওদা ব্লকে কল্যাণপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা প্রাপ্ত স্বয়ংসেবক তিনি। ১৯৯০ সাল থেকে মুর্শিদাবাদ জেলায় ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের সভাপতির দায়িত্বে তিনি ব্রতী হন। ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত তিনি ওই জেলার সভাপতি ছিলেন। ১৯৯৮ সাল থেকে প্রান্ত কার্যকারিণীর সদস্য হন। ২০০৫ সাল থেকে পুনরায় প্রান্ত কার্যকারিণী সদস্য হন। ২০২১ সাল থেকে বয়সজনিত কারণে তিনি দায়িত্ব মুক্ত হন। তবে তারপরও মুর্শিদাবাদ জেলার অভিভাবক হিসেবে কাজ দেখতে থাকেন তিনি।

সংগঠনের পক্ষে যখন যা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা সাধ্যমতো সম্পাদন করার চেষ্টা করছেন। আদ্যন্ত ভদ্র, সৌকর্যবান ও নির্বিবাদী মানুষ। গত ১৩ মে ভোর ৪ টায় প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে বাড়ি ফিরে আসার পর তাঁর ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয় এবং তার ফলেই তিনি প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গিয়েছেন স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র-পৌত্রী সমেত অজস্র কৃষক বন্ধু ও প্রিয়জনদের। ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের পক্ষ থেকে গত ১৫ মে পশ্চিম মেদিনীপুরের গোপালীতে অনুষ্ঠিত কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ বর্গে তাঁর আত্মার প্রতি চিরশান্তি কামনা করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর মালদা জেলার মালতীপুর শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক রঘুনাথ রায় গত ২৭ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি

তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। ১৯৬২ সালে তিনি স্বয়ংসেবক হন। ৬৫-তে প্রথমবর্ষ শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৭০-এ দ্বিতীয় বর্ষ এবং ১৯৭৫-এ তৃতীয় বর্ষ শিক্ষা গ্রহণ করেন। জরুরি অবস্থার প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ করে ১৫ মাস কারান্তরালে থাকেন।

* * *

হুগলী জেলার বিষড়ার স্বয়ংসেবক তথা পশ্চিমবঙ্গের ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের স্থপতি শিউপ্রসাদ সিং গত ২৭ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। রিষড়ার জয়শ্রী টেক্সটাইলে তিনি প্রথমে মজদুর

সঙ্ঘের দায়িত্বে আসেন। সেরা শ্রমিক শিক্ষকের পুরস্কার পেয়েছেন। ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের টেক্সটাইল মজদুর সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলা মজদুর সংবাদ পত্রিকার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

রেস্তোরাঁ মালিকদের সঙ্গে বৈঠকে কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। হোটেল-রেস্তোরাঁর বিলে সার্ভিস চার্জ বাধ্যতামূলক নয়। এটাই নিয়ম। বিলে সার্ভিস চার্জের জায়গায় ফাঁকা রাখতে হবে, এমনই বলা হয়েছে কেন্দ্রের সরকারি বিধিতে। বিল মেটানোর সময় কারও ইচ্ছা হলে নিজেই সার্ভিস চার্জের অঙ্ক বসিয়ে তা মিটিয়ে দেবেন। কিন্তু বাস্তবে এই নিয়মকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে হোটেল-রেস্তোরাঁগুলো বাধ্যতামূলকভাবে সাধারণ মানুষের থেকে সার্ভিস চার্জ আদায় করছে। সার্ভিস চার্জ যে সম্পূর্ণ ব্যক্তির ইচ্ছা নির্ভর, তাও জানানো হচ্ছে না ক্রেতাদের। এই সংক্রান্ত নানা অভিযোগ পেয়ে কেন্দ্রীয় উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রক এবার রেস্তোরাঁগুলিকে সতর্ক করল। শুধু তাই নয়, আগামী ২ জুন রেস্তোরাঁ মালিকদের জাতীয় সংগঠনের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছে মন্ত্রক।

উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রকের সচিব রোহিতকুমার সিংহ জাতীয় রেস্তোরাঁ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতিকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন, রেস্তোরাঁগুলি ক্রেতাদের থেকে বাধ্যতামূলকভাবে সার্ভিস চার্জ আদায় করছে, যা বেআইনি। জোর করে সার্ভিস চার্জ নেওয়া হচ্ছে ক্রেতাদের থেকে। তাও ইচ্ছেমতো চড়া হারে। বিল থেকে সার্ভিস চার্জ সরাতে বললে সাধারণ মানুষকে হেনস্থা করছে হোটেল-রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষ। জনসাধারণকে আইনের বিষয়ে ভুল বোঝানো হচ্ছে।

মন্ত্রকের বক্তব্য জাতীয় উপভোক্তা হেল্পলাইনে এ বিষয়ে বহু অভিযোগ জমা পড়েছে। উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রক সূত্রে খবর পাঁচ বছর আগেই এ বিষয়ে সরকারি নির্দেশিকা জারি করা হয়। কিন্তু বাস্তবে তা পালন হয়নি। অনেক রেস্তোরাঁ 'সার্ভিস চার্জ নেওয়া হয়' এমন নোটিস ঝুলিয়ে রাখছে রেস্তোরাঁর বাইরে। এটিও উপভোক্তা আইন বিরুদ্ধ।

সপ্তাহে দু'দিন মিতালি এক্সপ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে তৃতীয় রেলপথ হিসেবে ১ জুন থেকে এনজেপি-ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ট্রেন যোগাযোগ চালু হচ্ছে। চলবে 'মিতালি এক্সপ্রেস'। এনজেপি থেকে সপ্তাহে দু'দিন ছাড়বে ট্রেনটি। ১ জুন দিল্লিতে রেল ভবন থেকে মিতালি এক্সপ্রেসের সূচনা করবেন ভারত ও বাংলাদেশের দুই রেলমন্ত্রী। রেলমন্ত্রক থেকে যে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে, তাতে এনজেপি থেকে রবি ও বুধবার সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে মিতালি এক্সপ্রেস ঢাকার উদ্দেশে রওনা হবে। রেলমন্ত্রকের ডেপুটি ডিরেক্টর বিবেককুমার সিন্‌হা এই নির্দেশিকা করেছেন। তবে ভাড়ার তালিকা এখনও প্রকাশ করা হয়নি। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে বলেন, মন্ত্রক থেকে আমরা নির্দেশিকা পেয়েছি। তাতে ১ জুন থেকে মিতালি এক্সপ্রেস এনজেপি থেকে যাত্রা শুরু করবে। এখান থেকে রবিবার ও বুধবার ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের উদ্দেশে ট্রেনটি ছাড়বে।

নতুন আন্তঃরাজ্য পরিষদ গঠন

নিজস্ব সংবাদদাতা॥ নতুন আন্তঃরাজ্য পরিষদ গঠন করল ভারত সরকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই পরিষদের চেয়ারম্যান থাকছেন। সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসকদের এই পরিষদের সদস্য করা হচ্ছে। সদস্যপদ পাচ্ছেন ৬ জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও। ২ জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য করা হবে বলে সূত্রের খবর। একই সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চেয়ারম্যান করে আন্তঃরাজ্য পরিষদ সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিও গড়া হয়েছে। দুই কমিটির মূল লক্ষ্য হবে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যগুলির সমন্বয় বাড়ানো। কেন্দ্র-রাজ্য যুগলবন্দিতে দেশের সার্বিক উন্নয়নে জোর দিচ্ছে মোদী সরকার।

হোয়াটসঅ্যাপে ডিজিলকার চালু কেন্দ্রের

নিজস্ব সংবাদদাতা॥ হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে ডিজিটাল লকার (ডিজি লকার) পরিষেবা চালু করল কেন্দ্র। ভারত সরকারের অধীনে থাকা মাই-গভ জানিয়েছে, এবার থেকে হেল্পডেস্কে ম্যাসেজ পাঠিয়েই ব্যক্তিগত বিভিন্ন নথি পাবেন জনসাধারণ, যা আসলে পেপার ডকুমেন্টের মতোই ব্যবহার করা যাবে। এর মধ্যে থাকবে প্যানকার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, সিবিএসসি'র দশম শ্রেণী পাশের সার্টিফিকেট, দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর মার্কসিট, জীবন বিমা ও সাধারণ বিমার নথি (যা ডিজি লকারে রয়েছে), দু'চাকার গাড়ি বিমার নথি ও গাড়ি নথিভুক্তির সার্টিফিকেট (আরসি)।

বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ নথি পেতে ৯০১২১৫১৫১৫ নম্বরে গ্রাহককে 'নমস্তে' বা 'হাই' অথবা 'ডিজি লকার' লিখে পাঠাতে হবে বলে জানিয়েছে মাই-গভ। ইতিমধ্যে ১০ কোটিরও বেশি নাগরিক এই মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

ওএনজিসি'র অনলাইন লেনদেন

নিজস্ব সংবাদদাতা॥ প্রথম ভারতীয় গ্যাস উত্তোলন ও উৎপাদন সংস্থা হিসেবে ইন্ডিয়ান এক্সচেঞ্জের (আইজিএক্স) মাধ্যমে লেনদেন শুরু করল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ওএনজিসি। সম্প্রতি সংস্থাটি একটি বিবৃতির

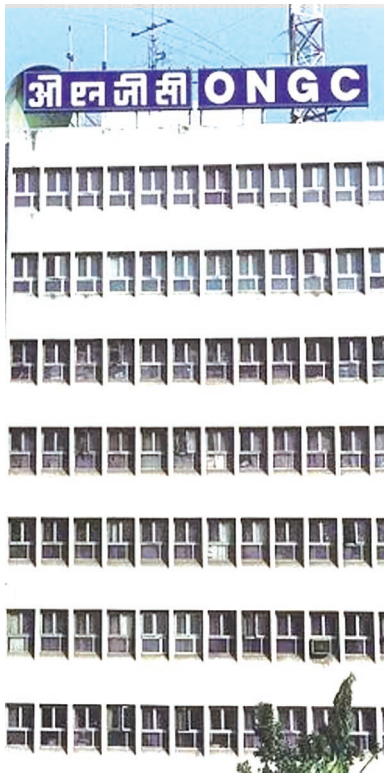

মাধ্যমে জানিয়েছে গত ২৩ মে প্রথমবার ইন্ডিয়ান গ্যাস এক্সচেঞ্জে অনলাইন লেনদেন করেছে তারা। পরিমাণের কথা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না করলেও পূর্ব উপকূলের কৃষ্ণা-গোদাবরী ৯৮ (২) ব্লক থেকে এই লেনদেন করবে ওএনজিসি। আগামীতে ধীরে ধীরে বাড়ানো হবে পরিমাণ।

কাশী বিশ্বনাথ মন্দির ভেঙেই তৈরি হয়েছিল জানবাপী মসজিদ : ইরফান হাবিব

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ আরঙ্গজেব কাশী ও মথুরা মন্দিরা ভেঙেছিলেন, একথা স্বীকার করলেন ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব। মুঘল আমলে হিন্দুমন্দিরগুলি ভেঙে মসজিদ গড়ে ওঠা নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘদিনের। বিতর্কিত মসজিদ নিয়ে সময়ান্তরে আবর্তিত হয়েছে ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। সম্প্রতি জ্ঞানবাপী মসজিদ নিয়ে আদালতের নির্দেশে মসজিদ চত্বরে সমীক্ষা চালানো হলে ওজুখানা থেকে পাওয়া যায় একটি ১২ ফুটের শিবলিঙ্গ। শিবলিঙ্গ উদ্ধারের পর জ্ঞানবাপী মসজিদ বিতর্ক নতুন করে মাথা চাড়া দিয়েছে। ইরফান হাবিবের স্বীকারোক্তি সেই বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাৎকার ইরফান হাবিব জানান, 'মথুরা- কাশীর মন্দির গুঁড়িয়ে দিয়েছিল আওরঙ্গজেব। সেই সময় হিন্দু মন্দির আক্রমণ, লুট ও ভেঙে দেওয়া ছিল স্বাভাবিক। মুঘল প্রশাসকরা এসব করতেন ঢাকঢোল পিটিয়েই।' মন্দির ভাঙার দিনক্ষণ সমস্তটাই ইতিহাসে নথিবদ্ধ হয়ে আছে বলে স্বীকার করেন ইরফান হাবিব। যদিও কিছুদিন আগেই জ্ঞানবাপীর ওজুখানায় পাওয়া শিবলিঙ্গের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন পদ্মভূষণ পুরস্কারে সম্মানিত এই ঐতিহাসিক। তাঁর দাবি ছিল ওজুখানায় উদ্ধার হওয়া শিবলিঙ্গটি আসলে একটি ফোয়ারা। মুঘল আমলে তৈরি বহু মসজিদেই এমন ফোয়ারা বসানো হতো। জ্ঞানবাপী নিয়ে তাঁর পুরনো অবস্থান বদলেছেন হাবিব।

সেই সঙ্গে তিনি জানান, রাজা বীর সিংহ বুন্দেলা নির্মিত মথুরা কেশবদেব মন্দিরও ধূলিসাৎ করেছিল আওরঙ্গজেব। তাঁর মতে, সমস্ত ক্ষেত্রেই ভেঙে দেওয়া মন্দিরের থাম, পাথর দিয়ে, একই ভিতের ওপরে মসজিদ গড়ে তুলতো মুঘলরা। কাশী-মথুরার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ঐতিহাসিক ইরফান হাবিরের নতুন বয়ান সামনে আসার পর, অভিজ্ঞ মহল মনে করছেন জ্ঞানবাপী মসজিদ কতৃপক্ষ এমনকী জমিয়তে-উলেমায়ে হিন্দের মতো মুসলমান সংগঠন যেভাবে আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হিন্দুপক্ষের সমস্ত দাবি নস্যাৎ করতে উঠে পড়ে লেগেছিল, ইরফান হাবিবের বিবৃতি তাদের কিছুটা হলেও ব্যাকফুটে ফেলে দিল। অযোধ্যায় রাম জন্মভূমিতেই যে বাবরি মসজিদ তৈরি হয়েছিল তা প্রমাণিত। জ্ঞানবাপী মসদিদ বিবাদও শীঘ্রই মিটবে বলে আশা করছেন হিন্দুপক্ষ। এরপর মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি,

কুতুব মিনার ও তাজমহলের সত্যিটা জনসমক্ষে আসবে বলে মন্তব্য করেছেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ-প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেদকর।

যোগ চিকিৎসা ডিপ্লোমা কোর্স

ডিপ্লোমা কোর্স অ্যাডভান্স থেরাপিউটিক হঠ এন্ড রাজযোগ
(D.A.T.H.R.Y.)

পাঠ্যসূচী ঃ ইনট্রোডাকশন টু ইন্ডিয়ান ফিলোসফি, অষ্টাঙ্গযোগ, অ্যানাটমি ও ফিজিওলজি, ফুড এন্ড নিউট্রিশন, সাম কমন ডিজিজেস, ইন্ডিয়ান ডায়াটেটিক্স, ভেষজ (হার্বাল) প্রয়োগ, ন্যাচারোপ্যাথি, রাজযোগ, ও কুন্ডলিনীযোগ, হরস্কোপ থেরাপি, মেডিটেশন প্রাকটিস, স্ট্রেস (Stress) ম্যানেজমেন্ট, যোগ প্রাক্টিক্যাল (আসন - প্রাণায়াম - মুদ্রা), থেরাপিউটিক ম্যাসাঝ (যৌগিক ও ফিজিওথেরাপি), স্ট্রেচিং, যৌগিক - চিকিৎসা (ট্রিটমেন্ট), প্রাক্টিস টিচিং।

সময়কাল ঃ ১ বছর। ২৬শে জুন থেকে আরম্ভ।
যোগ্যতা ঃ ১৮ বছর বয়স ও সর্বনিম্ন মাধ্যমিক পাশ।
ক্লাস ঃ প্রতি রবিবার ১টা থেকে ৪টা।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট
1977
অব কালচার, যৌগিক কলেজ
Regd. NGO, NITI AAYOG, New Delhi, Govt. of India

কোর্স ফি ঃ ১০,০০০ টাকা। এককালীন ৮০০০ টাকা। ইনস্টলমেন্টে প্রথমে ৫০০০ টাকা, পরের মাসে ২৫০০ টাকা করে।

ফর্ম ও প্রসপেক্টাস ঃ ১০০ টাকা
১০১, সার্দান অ্যাভিনিউ, কল-২৯
9051721420 / 9830597884

।। চিত্রকথা।। মহামানব মহানামব্রত।। ২।।

কালিদাস সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। কামিনীসুন্দরীও নিজের চেষ্টায় সংস্কৃত শিখে শাস্ত্র পড়তেন।

তাঁরা দু'জনে ভক্তি সংগীতও গাইতেন।

(ক্রমশ)